শেখ হাসিনার দুরদর্শী পরিকল্পনা আর সাহসের মূর্ত প্রকাশ পদ্মা সেতু

১০ অক্টোবর পদ্মা সেতুর লিংক প্রকল্পের ৮২ কিলোমিটার রেলপথ উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের প্রায় ২১টি জেলার মানুষ সরাসরি ঢাকার সঙ্গে কানেক্টেড হবে রেলপথে যুক্ত হবে। এই রেলপথ ঢাকা থেকে খুলনার যাত্রাপথ প্রায় ২১৫ কিলোমিটার কমিয়ে আনবে। কীভাবে? ঢাকা থেকে খুলনা ট্রেনে যেতে পশ্চিমাঞ্চল ঘুরে প্রায় ৪০০ কিলোমিটার পাড়ি দেয়ার এতদিনের সময় ১০-১২ ঘণ্টা। এবার নতুন রেলপথে যশোর যাওয়া যাবে ৩ ঘণ্টায়, আর খুলনা পৌঁছানো যাবে ৪ ঘণ্টায়।

পদ্মা সেতু দিয়ে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলকে যুক্ত করা এই রেললাইন সাধারণ কোনোকিছু নয়। পদ্মা সেতু দিয়ে দুই সারি কনটেইনারবাহী মালগাড়ি রেলপথে যাওয়ার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। নতুন উন্নত এই রেল নেটওয়ার্ক থেকে দেশকে লাভবান করতে আওয়ামী লীগ সরকার দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে গড়ে তুলছে প্রায় ১৮টি ইকোনমিক জোন। বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ তৈরি করতে পারলে সেখানে প্রায় ৭.৫ লাখ নতুন কর্মসংস্থান হবে বলে সরকারের আশা। দেশের বিশাল এক জনগোষ্ঠীর ভাগ্য বদলে দেবে এই রেলপথ, যা সম্ভব হচ্ছে পদ্মা সেতুর কারণে।

কিন্তু দেশের গর্ব এই মেগাস্ট্রাকচারের সুফল ভোগ করার চেয়ে প্রকল্পটির খুঁত ধরতে আজও ব্যস্ত একটি গোষ্ঠী। নিজ দেশের সাফল্যে অদ্ভুতভাবে হীনমন্যতায় ভোগা এসব মানুষ পদ্মা সেতুর খরচ নিয়ে অবান্তর প্রশ্ন তোলে। তাই বারবার বলতে হয়, এই সেতু শুধু একটি সেতু নয়, বাংলাদেশকে গরিব দেশ বানিয়ে রাখার দেশি-বিদেশি সব ষড়যন্ত্রের স্রোতের বিরুদ্ধে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে দেশকে নিজের পায়ে দাঁড় করানোর মহাকাব্য মূর্ত হলে তা দেখতে পদ্মা সেতুর মতোই হয়।

দক্ষিণ এশিয়ার দীর্ঘতম সেতু ভারতের ভূপেন হাজারিকা সেতু লম্বায় ৯.১৫ কিলোমিটার আর নির্মাণ ব্যয় ৯৫০ কোটি রুপি। এই সেতুর নদী শাসনে কোনো খরচই হয়নি। অন্যদিকে পদ্মা সেতুর দৈর্ঘ্য ৬.১৫

কিলোমিটার, বানাতে খরচ হয়েছে প্রায় ৩০ হাজার ১৯৩ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকা। প্রশ্ন তোলা হয়েছিলো, ভারতের সেতুটির তুলনায় ছোট হলেও পদ্মা সেতুর নির্মাণ ব্যয় অনেক বেশি হলো কেন?

সব ‘কেন’র উত্তর আছে। যারা দেশের উন্নয়ন সইতে পারে না, একই মিথ্যা বারবার বলে যারা মিথ্যাকে সত্যের মতো বানিয়ে ফেলার চেষ্টা করে, ‘উন্নয়ন’ শব্দটিকে যারা ট্রলে পরিণত করেছে, তাদের সমস্যা হলো, উত্তরগুলো তারা জেনেও জানে না, শুনেও শোনে না। ভারতের আসাম রাজ্যে লোহিত নদীর ওপর নির্মিত ভূপেন হাজারিকা সেতুর প্রস্থ ১২.৯ মিটার। আমাদের পদ্মা সেতুর প্রস্থ ১৮.৯ মিটার। ভূপেন হাজারিকা সেতুর পাইল লোড নেয়ার ক্ষমতা মাত্র ৬০ টন। অন্যদিকে পদ্মা সেতুর পাইল লোড ৮ হাজার ২১০ টন। ভূপেন হাজারিকা সেতুর চেয়ে পদ্মা সেতু ১৩৩ গুণ বেশি শক্তিশালী।

ব্রহ্মপুত্রের উপনদী লোহিত নদীর তলদেশে বেডরক পাওয়া যায় পদ্মা সেতুর চেয়ে অল্প গভীরতায়। ভূপেন হাজারিকা সেতু তৈরির সময় নদীর তলদেশে এত গভীরতায় যেতে হয়নি। পদ্মা নদীর গভীরতা নদীর পৃষ্ঠ থেকে চল্লিশ মিটার, প্রায় ১৩ তলা বিল্ডিংয়ের সমান। এই ৪০ মিটার উচ্চতা পার হয়েই নদীর উপর মাথা তুলেছে, গর্বের পদ্মা সেতুর কলাম বা পিয়ারগুলো।

পদ্মা নদীর তলদেশের মাটি পাথুরে নয়। নরম কাদা আর বালুর মিশ্রণ ওই মাটি ৪২টি দানবীয় পিলারের ভার কীভাবে নিয়েছে? নরম মাটির নিচে বেডরক প্রায় ৮ কিলোমিটার নিচে বলে ধারণা। এভারেস্ট পর্বতের উচ্চতার সমান গভীরতা পর্যন্ত পিলার স্থাপন তো অসম্ভব। আর পদ্মার তলদেশের মাটি স্থির থাকে না। বর্ষাকালে অতিরিক্ত স্রোত পদ্মা নদীর তলদেশের বালির মতো সেই নরম মাটি ধুয়ে নিয়ে যায়। একে ‘স্কাওয়ার’ হওয়া বলে। দক্ষিণ আমেরিকার অ্যামাজন নদীর পর পৃথিবীর সবচেয়ে খরস্রোতা পদ্মা নদীর স্কাওয়ার হওয়ার সর্বোচ্চ রেকর্ড প্রায় ৬৫ মিটার। মানে নদীর নিচ থেকে ২১৩ ফুট মাটি ধুয়ে চলে গেছে সাগরে। প্রায় ২১ তলা উঁচু বিল্ডিংয়ের সমান উচ্চতার সেডিমেন্ট অপসারণ করার রেকর্ড অন্য কোন নদীর নেই। সেকেন্ডে দেড় লাখ হাজার ঘনমিটার পানি বয়ে যায় এই নদী দিয়ে। এই পরিস্থিতিতে সেতুর কলামগুলোর দৈর্ঘ্য দাঁড়ায় ১০৫ মিটারের বেশি, মানে ৩৪ তলা বিল্ডিংয়ের সমান।

স্কাওয়ার যেহেতু নদীর সবখানে সমান নয়, তাই গড়ে ১২০ মিটার অর্থাৎ প্রায় ৪০ তলা বিল্ডিংয়ের সমান লম্বা ৩ মিটার ব্যাসের পুরু স্টিল

দিয়ে তৈরি পাইল বসানো হয়েছে। এটি একটি বিশ্বরেকর্ড। পাইলগুলো পদ্মার বুকে স্থাপনের জন্য এমন হ্যামার দরকার ছিলো, যা এর আগে পৃথিবীতেই ছিলো না। তাই জার্মানির মিউনিখ থেকে ৩৮০ টন ওজনের বিশেষ হ্যামার তৈরি করিয়ে আনানো হয়, যা আরেক বিশ্বরেকর্ড। মাটিতে বসানোর পর, পাইলগুলোর ভেতরের ফাঁপা অংশ ভরাট করে দেয়া হয়েছে।

প্রতি কলামের নিচে স্থানভেদে ৬টি বা ৭টি করে পাইল বসানো হয়েছে। তবে সেতুর দুই প্রান্তের দুটি কলামের নিচে আছে ১৬টি করে পাইল। মাকড়শা যেভাবে ৮টি পা ৮দিকে ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, সেভাবেই এই পাইলগুলো স্রোতের ধাক্কা সামলে কলামগুলোর ভারসাম্য রক্ষা করছে। এই ভারসাম্য রক্ষা করতে পাইলগুলো ভার্টিক্যালি মাটিতে গাথা হয়নি। মাকড়শার পায়ের মতোই বাঁকা করে, ইনক্লাইন্ডভাবে স্থাপন করা হয়েছে। ইনক্লাইন্ডভাবে থাকায় কলামগুলোর পক্ষে ভার নেয়ার ক্ষমতাও বেড়ে গেছে। ৬টি বা ৭টি পাইলের মাথায় আছে কংক্রিটের পাইল ক্যাপ, যা পানির উপরে দৃশ্যমান।

কিছু পিলারের পাইলিংয়ের কাজে পর্যাপ্ত মাটি না পাওয়ায় প্রকৌশলী ও বিশেষজ্ঞরা ‘স্ক্রিন গ্রাউটিং’ নামের এক বিরল পদ্ধতি ব্যবহার করে পদ্মা সেতুর ওই পিলারগুলো স্থাপন করেন। এই পদ্ধতিতে পাইলের সঙ্গে স্টিলের ছোট ছোট পাইপ ওয়েল্ডিং করে দেয়ার পর পাইপের ভেতর দিয়ে এক ধরনের কেমিক্যাল পাঠিয়ে দেওয়া হয় নদীর তলদেশের মাটিতে। কেমিক্যালের প্রভাবে তখন তলদেশের সেই মাটি শক্ত হয়ে ওঠে। এভাবে সেই মাটি পাইলের লোড বহনে সক্ষম হয়ে ওঠে। পৃথিবীর আর কোনো সেতু তৈরিতে পদ্মা নদীর মতো এত গভীরে গিয়ে নদীর তলদেশে পাইল গাথতে হয়নি।

কলামগুলোর ওপরে দৃশ্যমান প্রতিটা স্প্যানের দৈর্ঘ্য ১৫০ মিটার, ওজন ৩ হাজার ২০০ টন। পানিপথে তা পিলারের উপর স্থাপন করতে তৈরি করা হয় পৃথিবীর সবচেয়ে ভারবাহী ক্রেন। Warren type steel truss girder and concrete on upper deck টাইপের স্প্যানগুলো মিলে গড়ে তুলেছে ৬.১৫ কিলোমিটার লম্বা পদ্মা সেতু। দুই তলা এই ব্রিজের still truss এর মধ্য দিয়ে ট্রেনের লাইন। ডুয়াল গেজ এই রেললাইন দিয়ে ব্রড গেজ, মিটার গেজ দুই ধরনের ট্রেনই পদ্মা সেতু পার হতে পারবে। এখানে ইমার্জেন্সি একসেস পয়েন্ট থাকছে। ট্রেনে কোনো সমস্যা হলে, মানুষ নামিয়ে তাদের নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়া যাবে। দুইতলা পদ্মা সেতুর উপরে আছে কংক্রিটের ছাদ, যার উপর দিয়ে বর্তমানে গাড়ি চলছে। ২২ মিটার চওড়া এই রাস্তা চার লেনের।

আগেই বলেছি দেশের অর্থনীতিকে গতিশীল করতে পদ্মা সেতু দিয়ে কেমন হেভিওয়েট ট্রেন চলবে। সেই ব্যবস্থা করার জন্য মূল সেতুর লোড নেয়ার ক্ষমতা বাড়াতে হয়েছে। এজন্য পাইলগুলোকে বেশি মজবুত করে বানাতে হয়েছে, ফলে খরচ বেড়েছে।

পদ্মা সেতুর স্প্যান বসানোর আগে এগুলোর ও পিলারের মাঝে সিসমিক আইসোলেশন বিয়ারিং ব্যবহার করা হয়েছে। ফলে ভূমিকম্প যে এনার্জি নিয়ে এই স্ট্রাকচারকে আঘাত করবে, তা কমে যাবে। ভূমিকম্প হলে সেতুর ফাউন্ডেশন নড়লেও উপরের সেতুটি নড়বে না। কারণ এই সেতুতে আছে পেনডুলাম বিয়ারিং। এসব বিয়ারিংয়ের ভার বহনের ক্ষমতা ১০ হাজার মেট্রিকটন। এগুলোও পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী বিয়ারিং। রিখটার স্কেলে ৯ মাত্রার ভূমিকম্পও সামলাতে পারবে এগুলো।

পদ্মা সেতুর সাথে যে রাস্তাগুলো এখন আছে সেই রাস্তার সাথে সেতুর সংযোগ দিতে তৈরি করা হয়েছে অ্যাপ্রোচ রোড। এই অ্যাপ্রোচ রোড সেতুর চেয়ে দ্বিগুণ লম্বা, ১২ কিলোমিটার। এই পথ দিয়ে জাজিরা থেকে জাতীয় সড়কের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে। একইভাবে মাওয়ার কাছাকাছি যে রাস্তা ছিল সেটাকে আন্তর্জাতিক মানে তোলা হয়েছে। ভবিষ্যতে বন্যা হলে রাস্তা যেন পানির উপরে থাকে, তা মাথায় রেখে অ্যাপ্রোচ রোড তৈরি করা হয়েছে। জাজিরার রাস্তার এলাকাটা একসময় চর এলাকা ছিল। এত নরম মাটির ওপর দিয়ে রাস্তা করার জন্য মাটি ফেলে বাঁধের মত উঁচু জায়গা বানানো হয়েছে। এরপর রাস্তার নিচের মাটির ঘনত্ব বাড়ানোর চেষ্টা করা হয়েছে। অ্যাপ্রোচ রোডের নিচের মাটির ঘনত্ব বাড়াতে স্যান্ড কমপ্যাকশন পাইল মেশিন আনতে হয়েছে জার্মানি থেকে। এটি দিয়ে নরম মাটির স্তরে বালু পাঠিয়ে মাটির ঘনত্ব বাড়ানো হয়েছে।

পদ্মা সেতু বানানোর জন্য মাওয়া আর জাজিরা প্রান্তে দুটি বিশাল কন্সট্রাকশন ইয়ার্ড বানানো হয়েছিলো। বিশাল কন্সট্রাকশন ইয়ার্ড আর অ্যাপ্রোচ রোড নির্মানের জন্য বিশাল পরিমাণ জমি অধিগ্রহণ করতে হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের জন্য ৭টি রিসেটেলমেন্ট এরিয়া বরাদ্দ দেয়া হয়েছে নদীর দুই ধারে। সেখানে তাদের ঘরবাড়ি, মসজিদ, স্কুল, বাজার এগুলো সবই বানিয়ে দেয়া হয়েছে।

পদ্মা সেতু প্রকল্পে খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল নদীশাসন। নদীশাসন বলতে বোঝায়, নদীর গতিপথ ও তীর রক্ষার জন্য যে স্ট্রাকচারাল কাজ করা হয়। এই কাজের মধ্যে আছে নদী ড্রেজিং করা। নদীর পাড় পানির নিচে কেমন ঢালু হবে, তা নির্ধারণ করতে জিপিএস কন্ট্রোলড স্পেশাল

ড্রেজার ব্যবহার করা হয়েছে, যা পানির নিচের মাটি নিজেই হিসাব করে কেটেছে। নদীশাসনের আর একটা অংশ হিসেবে চলছে নদীর কিনারার দিকে পাথর, কংক্রিট ব্লক আর জিও ব্যাগ ফেলা হয়েছে।

মাওয়া প্রান্তে নদীশাসনের কাজ হয়েছে ১.৬ কিলোমিটারজুড়ে, আর জাজিরা প্রান্তে ১২.৪ কিলোমিটার। জাজিরা প্রান্তে এত বেশি কাজ হওয়ার কারণ হল, পানিপ্রবাহ উত্তর পশ্চিম থেকে প্রচণ্ড বেগে এসে জাজিরা সাইডে ধাক্কা দেয়। মাওয়া সাইটে মাটি কিছুটা ক্লে বা এঁটেল মাটি। দক্ষিণ দিকে জাজিরার সাইটে ক্লে নেই, সেখানে পলি, বালু এবং বেলে-দোআঁশ মাটি। স্রোত বেশি এলে এই মাটি ক্ষয় হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। জাজিরা প্রান্তে তাই নদীশাসন করা হয়েছে বেশি। আবার নিচ থেকে মাটি ধুয়ে উপর থেকে পাড় ভেঙে পড়া ঠেকাতে অনেক নিচে থেকে ১ হাজার কেজি ওজনের পাথর, কংক্রিট ব্লক আর কিছুটা নতুন প্রযুক্তির ৮০০ কেজি ওজনের জিও টেক্সটাইল ব্যাগ ব্যবহার করা হয়েছে।

এই নদীশাসন, প্রতি বছর বন্যার আশঙ্কা, ভূমিকম্প হওয়ার আশঙ্কা, ডিপ পাইল ফাউন্ডেশন, নদীর নরম তলদেশ, এক্সট্রিম স্কাওয়ার ডেপথ, জমি অধিগ্রহণ আর এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পুনর্বাসন, পরিবেশ রক্ষা করা, এই মেগা প্রকল্প সমন্বয়, সর্বোপরি নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু তৈরি করার মেগা চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে সফল হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এটি শুধুই মেগাস্ট্রাকচার তৈরিতে সাফল্যের গল্প নয়। সর্বগ্রাসী এই পদ্মা নদী পাড়ি দিতে গিয়ে প্রতিবছর কয়েকশ’ মানুষের মৃত্যু ঠেকিয়ে দিয়েছেন তিনি।

অসহনীয় যানজটে আটকে মালামাল নষ্ট হওয়া আর পরিবহনে দুর্ভোগের গল্প বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে এখন অতীত। রোগী পারাপার পদ্মার তীরের মানুষের কাছে আর দুঃস্বপ্ন নয়। তাদের বছরের পর বছর যে দুর্ভোগ, তার অবসান ঘটেছে। কীর্তিনাশা পদ্মার দুই পাড়ের যত জীবনের গল্প জোড়া লেগেছে, সামনে আরও তৈরি হবে জীবন বদলানো অনেক গল্প, সেসবের দাম ওইসব মানুষদের কাছে ৩০ হাজার কোটি টাকার চেয়েও বেশি।

লেখক: গণমাধ্যমকর্মী।

কৃষি নীতি: খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতার একটি নীলনকশা

আঠারো শতকের বাংলা ছিল একটি সমৃদ্ধি ও সুখের দেশ। সেই স্বর্ণযুগের বাংলাদেশ ছিল কৃষি প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ। দেশটি তখন কৃষি উৎপাদনের জন্য সারা বিশ্বে বিখ্যাত ছিল। মসলিন কাপড়, রেশম, তুলা, মশলা ইত্যাদি রপ্তানি করত বলে আমাদের এদেশ তখন অনেক বিদেশী ব্যবসায়ীকে আকর্ষণ করেছিল। অষ্টাদশ শতকে বাংলা ছিল তৎকালীন সময়ের একটি লোভনীয় বানিজ্য কেন্দ্র। সেসময়ের বাংলাকে জীবনমানের দিক থেকে গ্রেট ব্রিটেনের সাথে তুলনা করা হতো।

পরাধীনতার যাতাকলে বাংলার জৌলশ যখন অস্তমিত, সমৃদ্ধির দেশ যখন খাদ্য ঘাটতির দেশ হিসেবে নিমজ্জিত, দুর্ভিক্ষ ও দারিদ্রতা যখন জেঁকে বসেছিল বাংলায়, এ মাটিতে তখন আবির্ভাব হয় এক কালজয়ী নেতার-তিনি হলেন আমাদের বঙ্গবন্ধু। বাংলার গৌরবময় অতীতকে পুনরুদ্ধার করার চিন্তায় সর্বদা বিভোর থাকতেন তিনি। তিনি বিশ্বাস করতেন টেকসই কৃষি উৎপাদন অর্জনের মাধ্যমে বাংলার স্বর্ণযুগের গৌরবকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব।

বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ১৯৭১ সালের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর অর্থনৈতিক সংকট ছিল প্রকট। সকল ধরনের মৌলিক চাহিদা বিশেষকরে খাদ্য ঘাটতি ছিল প্রচুর। সারে সাত কোটি মানুষের দেশটিতে তখন খাদ্য ঘাটতি ছিল ২৫-৩০ লক্ষ মেট্রিক টন। স্বাধীন দেশের দায়িত্ব গ্রহণের পরই বঙ্গবন্ধু কৃষিখাতে বিশেষ জোর দিয়েছিলেন। তাঁর স্বপ্ন ছিল খাদ্যে বাংলাদেশকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা। নয় মাসের যুদ্ধ বিধবস্ত দেশটিতে কৃষকরা মাঠে ফসল ফলাতে সমস্যায় পড়েন। যুদ্ধের সময় অনেক কৃষককে বাড়ি ছেড়ে যেতে হয়েছিল, ফলে অনেকেই জমি চাষ করতে পারেনি। এছাড়া ফসল ফলানোর জন্য কোন বীজ, সার ও কীটনাশক ছিল না। সেচ সুবিধার ঘাটতিও ছিল প্রকট। বঙ্গবন্ধু ভাল করেই জানতেন দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে হলে কৃষি উৎপাদন বাড়ানো ছাড়া আর কোন বিকল্প নেই। তাই তিনি কৃষিক্ষেত্রের উন্নতির জন্য ১৯৭২ সালে সবুজ বিপ্লবের ডাক দেন এবং বালার জনগণকে বেশি বেশি ফসল ফলানোর তাগিদ দেন।

বঙ্গবন্ধু ১৩ জানুয়ারি ১৯৭২ সালে মন্ত্রিপরিষদের প্রথম বৈঠকেই কৃষকদের জন্য একটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। স্বাধীন

দেশের প্রথম আর্থিক বাজেটে, মোট ৫০০ কোটি টাকা উন্নয়ন বাজেটের মধ্যে ১০১ কোটি টাকাই তিনি বরাদ্দ প্রদান করেন কৃষি খাতে। তাঁর সরকার স্লোগানটিকে কেবল স্লোগান হিসেবেই ব্যবহার করেনি; বরং ২২ লাখের বেশি গৃহহীন কৃষক পরিবারকে অত্যন্ত কম সময়ের মধ্যে দক্ষতার সহিত পুনর্বাসন করেছিল। তিনি দেশের ভূমিহীন কৃষকদেরকে খাস জমি বিতরণের ব্যবস্থাও করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু কৃষির সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য একটি কার্যকরী সমীক্ষা সম্পন্ন করেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন একটি পূর্ণাঙ্গ সমীক্ষা ছাড়া কৃষিক্ষেত্রের উন্নয়ন সফল হবে না। যথাযথ পরিকল্পনার জন্য এটি অপরিহার্য ছিল। এ জরিপের ভিত্তিতে তিনি কৃষিক্ষেত্রের সার্বিক উন্নয়নের মহা পরিকল্পনা হাতে নিয়েছিলেন।

শিক্ষিত জনগণকে কৃষিকাজে সম্পৃক্ত করার জন্য বঙ্গবন্ধুর প্রচেষ্টা ছিল প্রবল। বঙ্গবন্ধুর সরকারের সময় কৃষকদের আধুনিক চাষাবাদ সম্মন্ধে যথেষ্ঠ জ্ঞান না থাকায় তিনি মেধাবী শিক্ষার্থীদের কৃষি শিক্ষা গ্রহণের উপর বিশেষ জোর দিয়েছেলেন যাতে করে তারা বাংলার কৃষকদের আধুনিক চাষাবাদের জন্য প্রশিক্ষিত করে তুলতে পারে।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধু ১৯৭৩ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহের সমাবর্তনে কৃষিবিদদের প্রথম শ্রেণির মর্যাদা প্রদানের ঘোষণা দিয়েছিলেন। সেদিন তিনি তাঁর বক্তৃতায় কৃষি গ্রাজ্যুয়েটদের উদ্দেশ্যে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছিলেন-”কৃষিক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য শুধু বই পড়াই যথেষ্ঠ নয়। প্রত্যেক কৃষিবিদকে গ্রামে যেতে হবে এবং কৃষকদের সাথে থেকে কাজ করতে হবে এবং বাংলার কৃষকদেরকে কৃষি বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত করতে হবে।

১৯৭৫ পরবর্তী দীর্ঘ ২১ বছরে বাংলাদেশের খাদ্য ঘাটতি কোন সরকারই মেটাতে সক্ষম হয়নি। এবপর বাংলার ভাগ্যাকাশে আবারও একটি গৌরবময় অধ্যায় লিখিত হয় ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত সময়ে, যখন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা সরকার গঠনের পরপরই পিতার অংকিত পরিকল্পনাকে হৃদয়ে ধারণ করে তাঁরই দেখানো পথ ধরে বাংলাদেশের কৃষি বিপ্লবের পূণর্জাগরণ করেন। মাত্র পাঁচ বছরের ব্যবধানে বাংলাদেশ খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করে।

সেই প্রথম মেয়াদে শেখ হাসিনার সরকার বিদ্যুৎ ও বিদ্যুৎ উৎপাদনে গৌরবময় সাফল্য অর্জন করেছিল। মাত্র পাঁচ বছরে মোট বিদ্যুত

উৎপাদন ১৯৯৫ সালের বেগম খালেদা জিয়া সরকারের ২,৯০৮ মেগাওয়াট থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০১ সালে শেখ হাসিনা সরকারের সময়ে ৪,৩০০ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছিল, যা সরাসরি কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে। ১৯৯৬-২০০১ সালে অওয়মী লীগ সরকারের আমলে দেশটি অভূতপূর্ব কৃষি প্রবৃদ্ধি দেখেছিল। ২০০১-২০০৬ সালে বিএনপি শাসনামলে প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত থাকেনি। বেগম খালেদা জিয়ার সরকার জনগনের প্রতি তাদের প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে ব্যর্থ হয় এবং সার, বীজ, ডিজেল প্রভৃতি কৃষি উপকরণ সংগ্রহ ও বিতরণে মারাত্মক অব্যবস্থাপনা করে। বিদ্যুৎ উৎপাদন মারাত্মকভাবে কমে আসে। এসব নেতিবাচক কর্মকা-◌ের কারণে খাদ্যে স্বনির্ভর একটি দেশ আবারও খাদ্য ঘাটতির দেশে পরিণত হয়।

এ অবস্থায় শেখ হাসিনার সরকার ২০০৯ সালের ৯ জানুয়ারি খাদ্যের মূল্য গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে নামিয়ে আনা এবং ২০১২ সালের মধ্যে দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার অঙ্গীকার নিয়ে দ্বিতীয়বার ক্ষমতা গ্রহণ করে। ২০০৭-০৮ এর খাদ্য সংকটের ধাক্কা এবং ২০০৯ সালের ঘুর্ণিঝড় আইলার আঘাতে ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতিকে কাটিয়ে উঠে কৃষি উৎপাদন বাড়াতে শেখ হাসিনার সরকার নানাবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করে। তাঁর সরকার সার, মানসম্মত বীজ, ডিজেলসহ অন্যান্য কৃষি উপকরণের উপর ভর্তুকি বৃদ্ধি করাসহ সহজ শর্তে কৃষকদের মাঝে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করে। এভাবে, ২০০৯ সালের শেষ নাগাদ কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ৩.৫% থেকে ৪.৫% এ ফিরে আসে।

২০০৯ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত শেখ হাসিনার ক্রমাগত সরকার কৃষি খাতে একটি অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছে যা একটি উল্লেখযোগ্য স্তরে দারিদ্র বিমোচন করেছে এবং বাংলাদেশ থেকে মঙ্গা দূরীভূত হয়েছে। শেখ হাসিনার সরকার দেশের ১০০% জনসংখ্যাকে বিদ্যুতের আওতায় নিয়ে এসেছে। যার ফলে কৃষিক্ষেত্রে সেচ ব্যবস্থাপনার অভাবনীয় উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। যার ফলে, ২০০৮-০৯ অর্থবছরে খাদ্যশস্যের উৎপাদন ৩২.৯০ মিলিয়ন টন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৪৭.৭৭ টনে পেীঁছেছে।

শেখ হাসিনা সরকারের কৃষি বান্ধব নীতির ফলস্বরূপ বাংলাদেশ এখন পাট রপ্তানিতে প্রথম, পাট উৎপাদনে দ্বিতীয়, হেক্টর প্রতি ফলের ফলন বৃদ্ধিতে প্রথম, শস্যের জাত উন্নয়নে প্রথম, সবজি উৎপাদনে তৃতীয়, চাল ও চা উৎপাদনে চতুর্থ, আম উৎপাদনে সপ্তম, পেয়ারা ও আলু উৎপাদনে চতুর্থ এবং স্বাদু পানির মাছ উৎপাদনে চতুর্থ। ২০২১ সালের তথ্যসম্বলিত ঋঅঙ কর্তৃক প্রকাশিত ২০২৩ সালের মার্চ মাসের রিপোর্ট ইঙ্গিত করে যে, ভূমির আয়তনের দিক থেকে বাংলাদেশ ৯৪তম

হলেও প্রাথমিক কৃষিপণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী ১৪তম স্থানে উঠে এসেছে। বাংলাদেশ বর্তমানে চাল, মসুর, আলু, পেঁয়াজ, চা এবং বিভিন্ন ফলসহ ২২ টি কৃষিজাত পণ্য উৎপাদনে ১০ টি শীর্ষ দেশের মধ্যে রয়েছে। বর্তমান সরকারের কার্যকর কর্মসূচির ফলে বাংলাদেশের ৪০০০ বিলিয়ন টাকা মূল্যের ৯ কোটি ৩৩ লাখ টন উল্লেখযোগ্য কৃষি উৎপাদন বৈশ্বিক কৃষি বাজারে দেশের কৃষি দক্ষতা ও গুরুত্বকে তুলে ধরে।
লেখক: চেয়ারম্যান, সার্জারি ও থেরিওজেনোলজি বিভাগ, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। পরিচালক, ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা

গণমাধ্যমে মার্কিন ভিসা নিষেধাজ্ঞা- চালুনি চোখ রাঙায় সুঁইরে

বাংলার ঘরে চালুনি আর সুঁই কে না চেনেন। কথায় আছে শতছিদ্রওয়ালা চালুনি ঠাট্টা করে সুঁইয়ের একটা ছিদ্র নিয়ে। বাংলাদেশের গণমাধ্যমের ওপর ভিসানীতি আরোপ নিয়ে রাস্ট্রদূত পিটার হাসের যে কড়া আলাপ, তা সেই প্রবাদ বাক্য মনে করিয়ে দেয়।

সম্প্রতি একটি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস উল্লেখ করেন, বাংলাদেশের গণমাধ্যমও যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়বে। এরপর বিষয়টি নিয়ে সাংবাদিক নেতা, সংগঠন, গণমাধ্যমকর্মীদের উদ্বেগ লক্ষ্য করা যায়। সম্পাদকদের সংগঠন এডিটর্স গিল্ড বাংলাদেশ পিটার হাসকে এক চিঠি পাঠিয়ে গভীর উদ্বেগও জানায় ।

গত ২৮ সেপ্টেম্বর ‘এডিটর্স গিল্ড বাংলাদেশ’ যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত পিটার হাসকে তার বক্তব্যের বিষয়ে উদ্বেগ জানিয়ে চিঠি পাঠায়। ৩ অক্টোবর পিটার হাস সেই চিঠির উত্তর দেন। তার চিঠির বাংলা অনুবাদ করলে যা দাঁড়ায় তাহলো, এডিটর্স গিল্ড থেকে চিঠি দেওয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। সম্প্রতি চ্যানেল ২৪-এ এক সাক্ষাৎকারে আমার দেওয়া বক্তব্যকে আরও বিস্তারিতভাবে তুলে ধরার

সুযোগের প্রশংসা করছি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গণমাধ্যমের স্বাধীনতা, সাংবাদিকদের অধিকার এবং বিশ্বব্যাপী গণমাধ্যমের বাকস্বাধীনতা রক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ যেকোনও সরকারের সমালোচনামূলক মতামত অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

সেক্রেটারি ব্লিঙ্কেন ২৪ মে ভিসা নিষেধাজ্ঞা নীতি নিয়ে বলেছেন, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে সবার দায়িত্ব রয়েছে—ভোটার, রাজনৈতিক দলগুলো, সরকার, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, সুশীল সমাজ এবং গণমাধ্যমসহ সবার। সমানভাবে এটি গুরুত্বপূর্ণ যে এসব প্রতিষ্ঠান যেন গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়ায় নিজ নিজ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পারে।

সেক্রেটারি ব্লিঙ্কেন নীতিটি সম্পর্কে যোগ করে বলেছেন, এটি যেকোনও বাংলাদেশি ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যাকে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়াকে ক্ষুণ্ন করার জন্য দায়ী বা জড়িত বলে মনে করা হবে।
এর মধ্যে যে কেউ অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন, যারা গণমাধ্যমকে তাদের মতামত প্রচার করা থেকে বিরত রাখার পদক্ষেপ নেয় এবং যদি সেই পদক্ষেপগুলো গণতান্ত্রিক নির্বাচনি প্রক্রিয়াকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। সরকার যখন তাদের রিসোর্স এবং সংস্থাকে ব্যবহার করে সেন্সরশিপ, ইন্টারনেট সংযোগকে সীমাবদ্ধ ও সাংবাদিকদের হয়রানি করবে, তখন আমরা আমাদের উদ্বেগ প্রকাশ করতে থাকবো।

‘মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গণমাধ্যমের স্বাধীনতাকে সমর্থন করে। যারা বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়াকে ক্ষুণ্ন করতে চায় তাদের বিরুদ্ধেও আমরা কথা বলবো এবং আমাদের ভিসানীতি প্রয়োগ করবো।’

পিটার হাসের চিঠির কথা জানিয়ে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এডিটর্স গিল্ড জানায়, ‘বাংলাদেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার এবং তাদের রাষ্ট্রদূতের অবস্থানের ওপর আস্থা ও বিশ্বাস রাখতে চায়। কারণ, তারা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হিসেবে সুপরিচিত।’

মিডিয়ায় যারা কাজ করেন তাদের উদ্বিগ্ন হওয়া স্বাভাবিক। গণমাধ্যম রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ। প্রশ্ন করা জরুরি, গণমাধ্যম কী কী ভাবে ভোটকে প্রভাবিত করবে বলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মনে করে। এর

মাপকাঠি তারা কিসের ভিত্তিতে তৈরী করেছে? সেই জায়গা থেকে গণমাধ্যমকর্মীদের ব্যাখ্যা চাওয়ার অধিকার আছে।

যে আমেরিকা বাংলাদেশের গণমাধ্যমকে চোখ রাঙায় তার নিজের দেশে সে কীভাবে মিডিয়াকে ব্যবহার করে- তার বহু নজির তারা সারা বিশ্ব রাজনীতিতে ছড়িয়ে রয়েছে।
মনে নেই কি কারো, সাবেক স্টেট সেক্রেটারি ও ডেমোক্রেট প্রার্থী হিলারি ক্লিনটনকে হারিয়ে ২০১৬ সালের নির্বাচনে জয়লাভ করেছিলেন রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প। যুক্তরাষ্ট্রের তখনকার নির্বাচনে মার্কিন গণমাধ্যম বড় ধরনের প্রভাব বিস্তার করেছিল। অনেকেরই ধারনা ছিল ট্রাম্প জয়লাভ করবেন না, জনপ্রিয়তার দিক থেকে হিলারি ছিলেন এগিয়ে। বলা হয়, ২০১৬ সালের মার্কিন নির্বাচনে যুক্তরাষ্ট্রের মিডিয়া বিতর্কিত ভুমিকা পালন করেছে।

বলা হয়ে থাকে ‘ঐতিহ্যগত’ ভাবেই যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনে গণমাধ্যম প্রভাব বিস্তার করে। ১৯৬০ সালের নির্বাচন থেকে এই প্রথা প্রচলিত। কারণ প্রার্থীর খবর যুক্তরাষ্ট্রের মানুষ গণমাধ্যম থেকেই বেশি পেয়ে থাকে। একজন প্রার্থীর বিষয়ে কীভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে, কতটুকু করা হচ্ছে তার প্রতি নাগরিকদের আলাদা দৃষ্টি থাকে। আর সেই দৃষ্টি থেকেই মার্কিন গণমাধ্যমের এই খোলামেলা অবস্থান সবার নজরে আসে।

কিংবা ধরুন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বুশের প্রথম পর্বের সামরিক মন্ত্রী কলিন পাওয়েল যখন জাতিসংঘের মতো একটি সংস্থায় সবিস্তারে বর্ণনা করেন যে ইরাকে সাদ্দাম হোসেনের জিম্মায় এমন সব মারাত্মক অস্ত্র আছে যা দিয়ে পৃথিবীকে ধ্বংস করে দেয়া সম্ভব, সাদ্দাম হোসেনের পতন না ঘটালে সারা দুনিয়া এক ভয়াবহ পরিনতি ভোগ করবে। সমগ্র বিশ্ব এই প্রচারনায় মেতে উঠলো যে ইরাকে সাদ্দাম হোসেনের কাছে “ওয়েপন অফ ম্যাস ডেসট্রাকশন” নামের এক মারাত্মক অস্ত্র আছে এবং এই অস্ত্রের একমাত্র টারগেট পশ্চিমা বিশ্ব। জাতিসংঘের অস্ত্র পরিদর্শক দল ইরাকে এমন কোনো অস্ত্রের সন্ধান পাননি, কিন্তু তাঁর পরেও আমেরিকা ও ইংল্যান্ড মিলে ইরাক আক্রমন করলো যার ভয়াবহ পরিনতির কথা আজ আমরা সকলেই জানি। সম্পূর্ণ ভুল ও বানোয়াট তথ্যের উপরে ভিত্তি করে মধ্যপ্রাচ্যের অন্যতম আধুনিক জনপদ ইরাককে ধ্বংস করে দেয়া হয়। প্রায় পাঁচ লাখ মানুষের মৃত্যু ও কয়েক কোটি মানুষের উদ্বাস্তু হওয়ার কথা আমরা সকলেই জানি।

নোম চমস্কি তাঁর লেখায় তথ্য উপাত্ত সহ ব্যাখ্যা করেছেন কিভাবে পশ্চিমা দেশগুলো তাদের নিজেদের বানানো বয়ান কে বাস্তবতা বলে প্রচার করে এবং এই সকল বয়ানের মূল লক্ষ্য হচ্ছে সমগ্র পৃথিবীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দখল নেয়া। সমগ্র পৃথিবীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দখল নেয়াটা কখনও ঘটেছে সরাসরি যুদ্ধের মাধ্যমে, কখনও ঘটেছে কোনো দেশে গৃহ যুদ্ধ বাঁধিয়ে দেয়ার মাধ্যমে, কখনও কোনো দেশে বা অঞ্চলে ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগিয়ে। আর এসবের অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে গণমাধ্যমকে। চমস্কি দেখিয়েছেন কীভাবে প্রোপাগান্ডা মডেল বা রাষ্ট্র কিভাবে প্রোপাগান্ডা মেশিন গড়ে তোলে ও তাকে ব্যবহার করে জনগনের মাঝে এর বয়ানের স্বপক্ষে সম্মতি উৎপাদন করার জন্যে।

সেই আমেরিকা যখন বাংলাদেশের গণমাধ্যমকে চোখ রাঙিয়ে বলে আভ্যন্তরীণ নির্বাচনে বিঘ্ন ঘটালে পড়তে হবে নিষেধাজ্ঞার আওতায় তখন বিস্ময় জাগে- আসলে কী নির্বাচনের জন্য তারা এসব বলছে? নাকি পিছনে বড় লুকায়িত কোনো স্বার্থ আছে, যা তারা ভয় দেখিয়ে অর্জন করতে চায়।

আরেকটা অতি প্রচলিত গল্প দিয়ে শেষ করি, একদিন এক বৃদ্ধার সন্তান মহানবী (সাঃ) কে বললেন তার মায়ের বহুমূত্র রোগ আছে। তাকে মিস্টি খেতে যেনো নবীজী নিষেধ করে দেন। মহানবী চুপ করে থাকলেন কিছুক্ষণ, তারপর সে সন্তানকে কিছুদিন পরে আসতে বললেন। সেই নির্ধারিত দিনে ছেলে তার মাকে নিয়ে গেলে নবীজি মাকে বুঝিয়ে বলেন কেনো তার মিস্টি খাওয়া ঠিক না। ছেলেটি তখন বললো- হে নবী, আপনি সেইদিনই কোনো কাজটি করলেন না। উত্তরে তিনি বলেছিলেন- সেসময় আমি নিজে মিস্টি খেতাম। সেদিনের পরে আমি নিজে মিস্টি খাওয়া ছেড়েছি। তারপর আমি মাকে ছাড়ার পরামর্শ দিয়েছি। আমেরিকা নিজে যা করে তার একভাগও করেনি এমন দেশকে চোখ রাঙায় কেবল মোড়লি জিইয়ে রাখতে।

লেখক: গণমাধ্যমকর্মী।

আইনের পথে হাঁটলেই মুক্তি পেতে পারেন খালেদা জিয়া

দুর্নীতি মামলায় সাজাপ্রাপ্ত বিএনপি প্রধান খালেদা জিয়াকে চিকিৎসার জন্যে দেশের বাইরে নেয়া নিয়ে চলছে নানা ব্যাখ্যা অপব্যাখ্যার ফুলঝুরি। বিএনপি এবং বিএনপিপন্থী আইনজীবীরা বলছেন সরকার ইচ্ছে করে আইনি জটিলতায় খালেদা জিয়ার চিকিৎসা করাতে দিচ্ছে না। আর অন্যান্য আইনজ্ঞরা বলছেন সরকার চাইলেই যা খুশি তাই করতে পারে না। সংবিধান এই স্বেচ্ছাচারের অধিকার কাউকে দেয় না। চলুন পাঠক আমরা দেখে নেই এনিয়ে কী বলেছেন বিএনপিপন্থী আইনজীবীরা এবং কী আছে আইনে।

আলোচনার সুবিধার জন্যে আমরা সরকারের আইনমন্ত্রীর বক্তব্য জেনে নিতে পারি। গত ৪ অক্টোবর সচিবালয়ে সাংবাদিকেদের তিনি বলেন, এখন আইনের পথে খালেদা জিয়ার চিকিৎসার জন্য বিদেশ যাওয়ার পথ বন্ধ। তবে তিনি যদি দোষ স্বীকার করে রাষ্ট্রপতির কাছে ক্ষমা চান, সেটা রাষ্ট্রপতি বিবেচনায় নিতে পারেন। এনিয়ে বিএনপিপন্থী আইনজীবীরা বলেন, আইনমন্ত্রী বা সরকার আইনের ভুল ব্যাখ্যা দিচ্ছে। আইন অনু্যায়ী খালেদা জিয়াকে সরকারই মুক্তি দিতে পারে। বিএনপির আইনবিষয়ক সম্পাদক ও খালেদা জিয়ার অন্যতম আইনজীবী কায়সার কামাল বলেন,ফৌজদারি কার্যবিধির ৪০১ ধারায় বলা আছে, সরকার চাইলেই নির্বাহী আদেশে যে কাউকে মুক্তি দিতে পারে এবং বিদেশে চিকিৎসার সুযোগ করে দিতে পারে।

সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী শাহদীন মালিক সংবাদ মাধ্যমে বলেন, ফৌজদারি কার্যবিধির ৪০১ ধারা অনুযায়ী সরকার নির্বাহী আদেশে খালেদা জিয়াকে শর্ত সাপেক্ষে মুক্তি দিয়েছে। ওই ধারাতেই বলা আছে, নির্বাহী আদেশে শর্ত ছাড়াই মুক্তি দেওয়া যায়। এমনকি সরকার সাজা মওকুফও করতে পারে। ফলে সরকারই শর্তহীন মুক্তি দিয়ে খালেদা জিয়াকে বিদেশে যাওয়ার অনুমতি দিতে পারে বলে তিনি মনে করেন।

এনিয়ে অ্যাটর্নি জেনারেল এ এম আমিন উদ্দিন বলেন চিকিৎসার জন্য দেশের বাইরে যেতে হলে খালেদা জিয়ার পরিবারের পক্ষ থেকে একটি আবেদন করতে হবে। পাশাপাশি সরকারকে আগের আদেশ প্রত্যাহার করে নতুন আদেশ জারি করতে হবে। এখানে আগের আদেশ বলতে সাজাপ্রাপ্ত হওয়ার

পরেও খালেদা জিয়াকে বাসায় চিকিৎসা নেয়ার যে সুযোগ দেয়া হয়েছে সেটার কথা বলা হয়েছে। অ্যাটর্নি জেনারেল সে ক্ষেত্রে কিন্তু কিছুটা জটিলতা আছে। সেই আদেশ প্রত্যাহার হলে তিনি আর বাইরে থাকতে পারবেন না। কারাগারে ফিরে যেতে হবে। তার পর সেই আবেদন বিবেচনায় আনা হবে।

এখন আসি নিরেট আইনে। ১৮৯৮ সালের ফৌজদারি কার্যবিধির ৪০১ ধারা অনুযায়ী সরকার চাইলে বিনাশর্তে বা শর্তসাপেক্ষে কারও দণ্ড স্থগিত করতে পারে। স্থগিতাদেশের সময় বাড়াতে পারে। আবার শর্ত ভাঙলে যে কোনো সময় স্থগিতাদেশ বাতিল করে দিতে পারে। আইনের উপধারা ১এ বলা হচ্ছে, কোনো ব্যক্তি কোনো অপরাধের জন্য দণ্ডিত হলে, সরকার যে কোনো সময় বিনা শর্তে বা দণ্ডিত ব্যক্তি যা মেনে নেয়, সেই শর্তে তার দণ্ড কার্যকরীকরণ স্থগিত রাখতে বা সম্পূর্ণ দণ্ড বা দণ্ডের অংশবিশেষ মওকুফ করতে পারবেন। আর উপধারা-৫ এ বলা হয়, রাষ্ট্রপতি চাইলে তার কাছে যে কোন দণ্ডপ্রাপ্তকে ক্ষমা করতে পারেন। এছাড়া তিনি সরকার সাধারণ বিধিমালা বা বিশেষ আদেশ দ্বারা দণ্ড স্থগিত রাখতেও পারবেন। তবে সবার আগে দণ্ডপ্রাপ্তকে দোষ স্বীকার করে আবেদন করতে হবে।

সম্প্রতি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক এস এম মাসুম বিল্লাহ জানান, খালেদা জিয়ার ব্যাপারে সরকারের সিদ্ধান্ত আক্ষরিকভাবে ঠিক আছে। কিন্তু এতে কিছু ভ্রান্তি তৈরি হচ্ছে। এই ভ্রান্তি দূর করতে কিছু বিষয় আলোচনা হওয়া দরকার। যেমন আইন বলছে, ক্ষমা প্রদর্শন বা শাস্তি কমানো কিংবা মওকুফ করা সরকারের নির্বাহী বিভাগের একটা গুরুত্বপূর্ণ সার্বভৌম কাজের অনুশীলন। কোনো অনিশ্চিত বা অস্পষ্ট ব্যাপারে রাষ্ট্রের নির্বাহী ক্ষমতা অনুশীলন করা উচিত নয়। কেননা, বিভিন্ন দেশের ইমিগ্রেশন আইন বা ভিসা আইনে দণ্ডিত ব্যক্তিকে সাধারণত ভিসা দেয়া হয় না। দিলেও সেটা প্রতিষ্ঠিত একটা ব্যতিক্রমের মধ্যে পড়তে হবে। অপরাধীর দণ্ড স্থগিতকরণ বা হ্রাসকরণ অপরাধীকে নির্দোষ বানিয়ে দেয় না। তার দণ্ডাদেশ সক্রিয় থাকে। তাই ধরা যাক রাষ্ট্র যদি, কোনো দণ্ডিতের সাজা স্থগিত করে বা কমিয়ে তাকে বিদেশ যাবার অনুমতি দেয়, সেই দেশের ইমিগ্রেশন আইন ১৭ বছরের দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে ভিসা দিতে অস্বীকৃতি জানাতে পারে।

এই অনিশ্চয়তার কারণে, রাষ্ট্রীয় নির্বাহী-সার্বভৌম ক্ষমতা অন্য দেশের ভিসা আইনের মুখাপেক্ষী করা যায় না। প্রার্থী তার আবেদনে কোনো নির্দিষ্ট গন্তব্য-দেশের নাম উল্লেখ না করলে এই অনিশ্চয়তা

বাড়ে। এই জটিলতার সঙ্গে আর একটা অভ্যন্তরীণ আইনি দিক যুক্ত আছে উল্লেখ ব্যাখ্যা করে মাসুম বিল্লাহ বলেন, পাসপোর্ট আদেশ ১৯৭৩-এর মুখবন্ধে বলা আছে যে, পাসপোর্ট ব্যবস্থা পরিচালিত হবে ‘জনস্বার্থে’। এই আইনে নৈতিক স্খলনজনিত ফৌজদারি কোনো অপরাধে কমপক্ষে দুই বছর দণ্ডিত কোনো ব্যক্তি পাসপোর্ট পাবার যোগ্য নন। নবায়নের ক্ষেত্রেও সেই একই আইন প্রযোজ্য।

তিনি বলেন, এখন খালেদা জিয়া যদি সত্যিই বিদেশে যেতে চান এবং তার মেডিক্যাল রিপোর্ট সাপোর্ট করে তাহলে একটাই আইনি পথ খোলা আছে। সংবিধানের ৪৯ নং অনুচ্ছেদ অনুসারে রাষ্ট্রপতির কাছে দাক্ষিণ্য আবেদন করা। ৪০১ ধারার অধীনেও সরকারের কাছেও দণ্ড মওকুফের আবেদন সম্ভব। তবে একটা কারণেও ৪০১-এর অধীনে মওকুফ আবেদন কোনো কাজে আসবে না, তা হলো ৪০১-এর মওকুফ আবেদনকারীকে নির্দোষ করে না। সুতরাং তার আইনজীবীদের প্রথমেই আদালতের রায় মেনে নিতে হবে।

আইনজ্ঞ মাসুম বিল্লাহ তার পর্বেক্ষণে বলেন, খালেদা জিয়ার আইনজীবীরা আইনের পথেই হাঁটছেন না। তারা যতটা না খালেদা জিয়ার আইনজীবীরা তার চেয়ে বেশি বিএনপির আইনজীবী। তাদের কথায় মনেই হয না যে খালেদার বিচার আইন অনুযায়ী হয়েছে। তারা তাকে নির্দোষ প্রমাণ করার চেয়ে প্রমাণ করতে চান যে, তিনি রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার হয়ে বিনা কারণে জেলে আছেন। অথচ যে মামলায় তিনি সাজা প্রাপ্ত হয়েছেন সেই মামলার সঙ্গে সরকারের কোন যোগসূত্রই নেই। মামলা করেছিল ২০০৭ এর তত্বাবধায়ক সরকার।

বিএনপির আইনজীবীদের হোমওয়ার্ক বাড়াতে বলেন মাসুম বিল্লাহ। আমাদের ভাবতে হবে, ‘তিনবারের প্রধানমন্ত্রী’ যুক্তি জ্ঞাত আইনবিজ্ঞানের কোনো ফর্মুলায় পড়ে না। বরং ‘তিনবারের প্রধানমন্ত্রী’ হবার কারণেই তার ক্ষেত্রে ৪০১ ধারা সতর্কভাবে প্রয়োগ হওয়া উচিত। ওই পয়েন্টে বার বার তারা হেরে যাবেন। মানবিক গ্রাউন্ড কথাটা ঠিক হয় না। কারণ ৪০১ ধারা নিজেই একটা মানবিক ধারা। যার বেনিফিট খালেদা জিয়া নিচ্ছেন। মনে রাখতে হবে, এটা স্কুলের টিউশন ফি কমানোর কোনো দরখাস্ত নয়। প্রকৃতপক্ষে, গ্রাউন্ডটা হবে, মানবাধিকার গ্রাউন্ড। খালেদা জিয়ার বর্তমান বয়স,করোনা সার্কামস্টেন্সেস, রাইট টু লাইফ, রাইট টু হেলথ, রাইট টু ডিউ প্রসেস, প্রিজাম্পশন অব ইনোসেন্স, বেনিফিট অব টু কনস্ট্রাকশন ইত্যাদি গ্রাউন্ডে ৪০১-এর আবেদন করতে হবে।

এখন দেখা যাক যদি সত্যিই খালেদা জিয়াকে চিকিৎসার জন্যে বিদেশে

নিতে হয় তাহলে কী করতে হবে তাঁর পরিবারকে। প্রথমে এই মামলায় উচ্চ আদালতের আপিল প্রত্যাহার করতে হবে। পরে রাষ্ট্রপতির কাছে নিজের অপরাধ স্বীকার করে ক্ষমা চাইতে হবে। রাষ্ট্রপতির অনুকম্পা পেলেই কেবল, ফৌজদারি দণ্ড প্রশমন হয়, এবং দণ্ডিত তার হারানো সিভিল অধিকারগুলো ফেরত পান। তখন আর সেটা ইমিগ্রেশন আইন বা ভিসা আইনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হয় না। আর তখনই কেবল আবেদনকারী বিদেশে যেতে পারেন।

লেখক: গণমাধ্যমকর্মী।

ভিক্ষুক পুনর্বাসনে শেখ হাসিনা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে প্রণীত সংবিধানের ১৫(ঘ) ও ১৯ অনুচ্ছেদে সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার, অর্থাৎ বেকারত্ব, ব্যাধি বা পঙ্গুত্বজনিত কিংবা বৈধব্য, মাতাপিতৃহীনতা বা বার্ধক্যজনিত কিংবা অনুরূপ অন্যান্য পরিস্থিতিজনিত আয়ত্তাতীত কারণে অভাবগ্রস্ততার ক্ষেত্রে সরকারী সাহায্যলাভের অধিকার ও মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ করিবার জন্য, নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করিবার জন্য এবং প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমান স্তর অর্জনের উদ্দেশ্যে সুষম সুযোগ-সুবিধাদান নিশ্চিত করিবার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন” এ আইন প্রণয়ন করেন এর পর দীর্ঘ দিন ভিক্ষুকদের নিয়ে তেমন কোন কাজ চোখে পড়েনি,স্বৈরশাসক ও বি এন পি জামায়াত জোট সরকারের আমলে যেমন বেড়েছে দুর্নীতি তেমনি বেড়েছে দারিদ্রের হার ও ভিক্ষুকদের সংখ্যা।

১৯৯৬ সালে বঙ্গবন্ধু তনয়া দেশরতœ শেখ হাসিনা ক্ষমতায় আসার পরই ভিক্ষুকদের প্রতি এবং তাদের পুর্নবাসনে প্রথম নজর দেন। এর পর ২০০৯ সালে দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় এসেই বঙ্গবন্ধু সোনার বাংলা ও ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যেকে সামনে নিয়ে ভিক্ষুক মুক্ত বাংলাদেশ গড়ার কাজে হাত দেন। তারই ধারাবাহিকতায় অন্তর্ভূক্তিমুলক উন্নয়নের অংশ হিসেবে এবং একই সাথে দারিদ্র্যতা নিরসন ও

ভিক্ষাবৃত্তির মত অমর্যাদাকর পেশা থেকে মানুষকে নিবৃত্ত করার লক্ষ্যে ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য সরকারের রাজস্ব খাতের অর্থায়নে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় বিগত ২০১০ সালের আগস্ট হতে ‘‘ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান’’ শীর্ষক কর্মসূচি গ্রহণ করে। সেই লক্ষ্যে ঢাকা শহরের ২০০০ ভিক্ষুকের পুনর্বাসন এবং পর্যায়ক্রমে ভিক্ষাবৃত্তি নিরসন” এই লক্ষ্য নির্ধারণ করে ২০১০ সালে প্রাথমিক ধারণাপত্র প্রণয়ন করা হয়। ঢাকা শহরের সকল ভিক্ষুককে জরিপের আওতায় এনে তা থেকে পাইলটিং পর্যায়ে ২০০০ ভিক্ষুককে পুনর্বাসন করার বিষয়টি সংযোজিত হয়।

কর্মসূচির বাস্তবায়ন পর্যায়ে ১০টি এনজিও নিয়োগ করে ঢাকা শহরের দশটি জোনে একই দিনে ১০,০০০ জন ভিক্ষুকের উপর জরিপ কার্য পরিচালনা করা হয় এবং জরিপে প্রাপ্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে ১০,০০০ ভিক্ষুকের ডাটাবেইজ তৈরি করা হয়। ধারণাপত্রের আলোকে কর্মসূচির পাইলটিং পর্যায়ে ভিক্ষুক পুনর্বাসন কর্মসূচি পরিচালনার জন্য ভিক্ষুকের সংখ্যা বিবেচনায় প্রাথমিকভাবে ময়মনসিংহ, ঢাকা, বরিশাল ও জামালপুর জেলাকে নির্বাচন করা হয় এবং প্রতিটি জেলায় ৫০০ জন করে মোট ২০০০ জনকে পুনর্বাসনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এছাড়াও ২০১৮ সালে ভিক্ষুক মুক্ত বাংলাদেশ গড়ার জন্য সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের তত্ত¡◌াবধানে “ভিক্ষুক পুর্নবাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান নীতিমালা গ্রহণ করেন। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিবকে প্রধান করে ১২ সদস্য বিশিষ্ট একটি জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করা হয়, এছাড়া প্রতিটি বিভাগ, জেলা, উপজেলা, পৌরসভা ও সিটি কর্পরেশনে আলাদা স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করা হয়েছে, যাদের কাজ হলো প্রকৃত ভিক্ষুক খুজে বের করা, তাদের আশ্রয়ন, কর্মসংস্থানের ব্যাবস্থা ও ডিজিটাল ডাটাবেস সংরক্ষণ এবং প্রতি মাসে একটি সভা করা সহ ১৩ টি দায়িত্ব পালন করে থাকে।

২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে প্রথম বারের মত দেশের ৫৮টি জেলায় ভিক্ষুক পুনর্বাসনও বিকল্প কর্মসংস্থানের নিমিত্ত অর্থ প্রেরণ করা হয়। ভিক্ষাবৃত্তি কখনই সম্মানজনক জীবিকা বা পেশা হতে পারে না। সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগ সত্বেও এক শ্রেণির জনগোষ্ঠী শহরের গুরুত্বপূর্ণ কিছু এলাকায় বিভিন্ন উপলক্ষ্যে বিশেষ করে রোজা, কোরবানীর ঈদসহ বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠাণ সামনে রেখে গ্রামাঞ্চল থেকে শহরে চলে আসে ভিক্ষাবৃত্তির জন্য। ট্রাফিক সিগন্যালে গাড়ি থামলে ভিক্ষুকরা অনেক সময় যাত্রীদের বিব্রত করে এবং বিদেশি

নাগরিকদের নানাভাবে উত্যক্ত করে।এ সকল বিষয়কে বিবেচনায় এনে ভিক্ষাবৃত্তিকে বন্ধ করতে হলে প্রথমেই ভিক্ষা প্রদানকে নিরুৎসাহিত করতে ও ২০৩০ সালের মধ্যে জাতিসংঘের সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা পূরনের জন্য এবং স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার জন্য ২০৩০ সালের মধ্যে সরকার ভিক্ষুক মুক্ত বাংলাদেশ গড়তে বদ্ধ পরিকর।

ভিক্ষাবৃত্তির ইতিহাস বহু পুরানো, ১৪৯৫ বৃটিশ রাজা সপ্তম হেনরির সময় প্রচুর ভিক্ষাবৃত্তি দেখা দেয়,যার ফলে তখন আলাদা আইন প্রনয়ন করতে হয়। প্রাচীন বাংলা ছিল অর্থনৈতিকভাবে অত্যন্ত সমৃদ্ধ জনপদ। কিন্তু বিগত কলোনিয়াল ও পাকিস্তানী শাসকদের শোষণ, বঞ্চনা, লুটপাট, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, নেতৃত্বের ব্যর্থতা এবং বিভিন্ন প্রাকৃতিক দূর্যোগ, নদী ভাঙ্গন, দারিদ্র্য, রোগ-ব্যাধি, অশিক্ষা ইত্যাদি কারণে এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে। তখন থেকে এ উপমহাদেশে ভিক্ষাবৃত্তি ব্যপক আকার ধারণ করে। সামাজিক স্বীকৃতি না থাকলেও অনেকেই ভিক্ষাবৃত্তিকে পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছে। আবার অনেকেই ভিক্ষাবৃত্তিকে ব্যবসা হিসেবে গ্রহণ করেছে। যারা পেশা হিসেবে ভিক্ষাবৃত্তিকে বেছে নিয়েছে তাদের নৈপথ্যে অর্থনৈতিক দুর্বলতা, সামাজিক নির্যাতন এবং নিঃস্ব হয়ে যাওয়ার বিষয়টি জড়িত। যারা ভিক্ষাবৃত্তিকে ব্যবসা হিসেবে ব্যবহার করে তাদের বিরুদ্ধে আইনের কঠোর প্রয়োগের জন্য সরকার মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করছেন। কিন্তু আইনের মাধ্যমে বা শাস্তি দিয়ে প্রকৃতভাবে অসহায়ত্বের কারণে যারা ভিক্ষাবৃত্তির চর্চা করে তাদের নির্মূল করা যাবে না,এজন্য দরকার জনসচেতনতা ও সকলের সহযোগিতা।

বর্তমান বিশ্বের প্রায় সব রাষ্ট্রেই আর্থিক দুর্দশায় নিপতিত নাগরিকের জন্য সম্পদ হস্তান্তরের মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি রয়েছে। বাংলাদেশে ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ১ লাখ ১৩ হাজার ৫৭৬ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছিল। এবার ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাজেটে এ খাতে বরাদ্দ বাড়িয়ে মোট ১ লাখ ২৬ হাজার ২৭২ কোটি টাকা করার প্রস্তাব করেছেন অর্থমন্ত্রী। অস্বীকার করার সুযোগ নেই, বিগত দুই দশকে বাংলাদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যপক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে স্বল্পোন্নত অবস্থান থেকে উন্নয়নশীল দেশের তালিকায় উত্তরণ ঘটেছে। এ পরিবর্তনে সবচেয়ে বড় নিয়ামক ছিল নেতৃত্বের সদিচ্ছা। বঙ্গবন্ধুর সংগ্রাম ছিল এ দেশের মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর। তিনি একটি সুখী সমৃদ্ধ এবং কাঙ্খিত আত্মমর্যাদাশীল জাতির সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখেছিলেন।

বঙ্গবন্ধুর সেই সোনার বাংলার স্বপ্ন তার সুযোগ্য কন্যা শেখ হাসিনা বাস্তবায়ন করার জন্য নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গৃহহীনদের ঘর নির্মাণ করে দিচ্ছেন এবং ভূমিহীনদের জমি লিখে দিয়ে সেখানে বাড়ি নির্মাণ করে দিচ্ছেন।

সকল শ্রেণিপেশার মানুষের উন্নয়নের মধ্য দিয়ে স্মার্ট বাংলাদেশের কাঙ্খিত লক্ষ্যে উপনীত করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বঙ্গবন্ধু তনয়া শেখ হাসিনা। তাই ভিক্ষুকদের আত্মনির্ভরশীল ও স্বাবলম্বী করতে দেশের বিভিন্ন জেলা ও উপজেলায় ভিক্ষুকদের পুনর্বাসনের মাধ্যমে তাদের সামাজিক মর্যাদা ফিরিয়ে এনেছেন। দেশে প্রায় ১৪ হাজার ৭০৭ জন ভিক্ষুককে মুদি দোকান, ছাগল, হাঁস-মুরগির খামার, গরুর খামার, রিকশা ও ভ্যান উপকরণ প্রদানের মাধ্যমে ভিক্ষা পেশা থেকে কর্মসৃজনের মাধ্যমে আয় করার সুযোগ দেয়ার যে অন্যন্য নজির স্থাপন করেছেন তা বিশ্বে বিরল। এরা শুধু আয় করে জীবিকা নির্বাহ করছেন তা নয়, দেশ ও সমাজে তাদের সামাজিক মর্যাদা ফিরিয়ে এনেছেন। পেয়েছেন সমাজে মাথা উঁচু করে চলার সুযোগ।

ভিক্ষকুদের ভিক্ষা করা থেকে ফিরিয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে ভিক্ষুক পুনর্বাসন কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রতিটি মানুষের জন্য একটি উন্নত জীবন গড়ে তুলতে দেশে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার পাশাপাশি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থানসহ রাস্তাঘাটের উন্নয়ন সাধিত করে গ্রামকে শহরে পরিণত করেছেন। এখন ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’ গড়ার কাজ দ্রুত গতিতে চলছে।

ঢাকা শহরে ভিক্ষাবৃত্তি রোধের জন্য প্রাথমিকভাবে সিটি কর্পোরেশনের কিছু এলাকা ভিক্ষুকমুক্ত ঘোষণা করেছে। এলাকাগুলো হচ্ছে- বিমান বন্দরে প্রবেশ পথের পূর্ব পাশের চৌরাস্তা, বিমান বন্দর পুলিশ ফাঁড়ি ও এর আশ-পাশ এলাকা, হোটেল রেডিসন সংলগ্ন এলাকা, ভিআইপি রোড, বেইলী রোড, হোটেল সোনারগাঁও ও হোটেল রূপসী বাংলা সংলগ্ন এলাকা, রবীন্দ্র সরণী এবং কূটনৈতিক জোনসমূহ। ঢাকা শহরের ভিক্ষুকমুক্ত ঘোষিত এলাকাসমূহ ভিক্ষুকমুক্ত রাখার লক্ষ্যে নিয়মিত মাইকিং, বিজ্ঞাপন, লিফলেট বিতরণ এবং বিভিন্ন স্থানে নষ্ট হয়ে যাওয়া প্লাগস্ট্যান্ড মেরামত/নতুনভাবে স্থাপন করার কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়াও ঢাকা শহরের ভিক্ষুকমুক্ত ঘোষিত এলাকায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে আটককৃত ভিক্ষুকদের আশ্রয়কেন্দ্রে রাখার নিমিত্তে ৫টি সরকারি আশ্রয়কেন্দ্রের অভ্যন্তরে ফাঁকা জায়গায় অস্থায়ী ভিত্তিতে ১৬টি টিনসেড ডরমিটরি ভবন নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

ভিক্ষুক পুনর্বাসনের কাজটি পদ্ধতিগতভাবে করার জন্য একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকার শুধু যে ঢাকায় পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছে তা নয়, বরং সারা দেশেই এমন প্রকল্প বাস্তবায়নে কাজ চলছে। তারই ধারাবাহিকতায় চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জে পেশাদার ভিক্ষুকদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ৫ জন ভিক্ষুককে ডাব বিক্রয়ের উপকরণ, একটি করে ভ্যান ও ১০০টি করে ডাব বিতরণ, নাটোর পৌরসভা ও নাটোর সদর উপজেলার ১০জন ভিক্ষুকের মাঝে একটি করে দোকানঘরের চাবি ও নগদ পাঁচ হাজার টাকা প্রদান, চাঁদপুর বাগাদীতে ৪০ জন ভিক্ষুকদের পূনর্বাসনে নগদ অর্থ প্রদান, সুনামগঞ্জে ৪জন ভিক্ষুককে মুদি দোকানের মালামাল প্রদান, বাঘায় ১৪ জনকে ভিক্ষুককে ছাগল, শেলাই মেশিন, কাপড়, মুদি দোকান, বেত সামগ্রী, জুতার ও ভ্রাম্যমাণ মাছের দোকান প্রদান, আলমডাঙ্গায় ৪ জন ভিক্ষুককে গরু ও ১ জন ভিক্ষুককে পাখি ভ্যান বিতরণ, নোয়াখালীর সেনবাগের নবীপুরে নগদ অর্থ প্রদান, রাজবাড়ীর গোয়ালন্দ উপজেলায় ভিক্ষুক পুনর্বাসন কর্মসূচির অংশ হিসেবে চার ব্যক্তিকে চার লাখ টাকা প্রদান, কুলাউড়া উপজেলার ৪০ জন ভিক্ষুকের মধ্যে ছাগল বিতরণ, দিনাজপুরের ১৩ উপজেলায় ১ হাজার ৩৫০ জন ভিক্ষুককে পুনর্বাসন, মাদারীপুরের ডাসার উপজেলায় ৮ জন ভিক্ষুকদের মাঝে ১ লক্ষ ৯২ হাজার টাকা মূল্যের গরু- ছাগল বিতরণ, ময়মনসিংহের নান্দাইল উপজেলায় ৩২ জনকে বিভিন্ন উপকরণ বিতরণ, গোপালগঞ্জে ছয়জন ভিক্ষুকের হাতে মোট একলাখ ৯৫ হাজার টাকার চেক প্রদানসহ সারা দেশে প্রায় ১৪ হাজার ৭০৭ জন ভিক্ষুককে পুনর্বাসন করেছে বর্তমান সরকার। বাকিদের পুনর্বাসনের কাজ চলমান রয়েছে।

সেদিন খুব বেশি দূরে নয়, যেদিন আমাদের দেশে কোনো ভিক্ষাবৃত্তি থাকবে না। একসময় বাংলাদেশকে তলাবিহীন ঝুড়ি বলা হতো। দেশ চলতো বৈদেশিক দাতা সংস্থাদের অর্থে। এখন সে ধারণা পালটে গেছে। বাংলাদেশ পরের উপর নির্ভরতা হতে বেরিয়ে এসেছে। নিজ অর্থে বড় বড় মেগা প্রকল্প হাতে নিয়ে সফল হয়েছে। ইতোমধ্যে ঢাকার বেশ কয়েকটি জায়গা ভিক্ষুকমুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে, ক্রমান্বয়ে সকল জেলা ভিক্ষুকমুক্ত করা হবে, সরকার বিভিন্ন সময় ভিক্ষুকদের পুনর্বাসনে ক্রাস প্রোগ্রাম হাতে নিয়ে থাকে যা এখন ও চলমান। গত ১৫ বছরে সম পর্যায়ের যেকোন দেশ হতে অনেক এগিয়ে গেছে বাংলাদেশ। এক্ষেত্রে একটা বিষয় ম্যাজিক হিসেবে কাজ করেছে আর তা হচ্ছে শেখ হাসিনার অদম্য নেতৃত্ব।

লেখক: সহকারী অধ্যাপক, লোকপ্রশাসন বিভাগ, বেগম রোকেয়া

বিশ্ববিদ্যালয়।

তৃতীয় টার্মিনাল: বাংলাদেশকে বানাবে দক্ষিণএশীয় অর্থনৈতিক হাব

পদ্মা সেতু ও পদ্মা রেল সেতুর মাধ্যমে সড়ক ট্রান্স এশিয়ান হাইওয়ে এবং ট্রান্স এশিয়ান রেলপথে নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগে যুক্ত হচ্ছে বাংলাদেশ। এরইমধ্যে বাংলাদেশ মাতারবাড়িতে গভীর সমুদ্র বন্দর এবং চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দরের আধুনিকায়নের মাধ্যমে সমুদ্রযোগাযোগেও নতুন দিগন্তের দেখা পেয়েছে। সর্বশেষ ঢাকা বিমানবন্দরের আধুনিকায়নের মাধ্যমে বিমান যোগাযোগের ক্ষেত্রেও বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বার বার বলেছেন, বাংলাদেশ হবে দক্ষিণ এশিয়ার অর্থনীতির হাব। ভৌগলিকভাবে ভারত, চীন এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর মাঝামাঝি হওয়ায় দক্ষিণপূর্ব এশিয়া এবং মধ্যপ্রাচ্যের সাথে যোগাযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে বাংলাদেশ। এই অবস্থানগত সুবিধা অর্থনৈতিক কার্যক্রমে রূপান্তরের জন্য সড়ক, রেল, নৌ এবং বিমান যোগাযোগ সমন্বিত হচ্ছে বাংলাদেশে। বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনাল সেই সমন্বিত উদ্যোগেরই অংশ।

আজকের এই ঝা চকচকে তৃতীয় টার্মিনালে ঢোকার আগে আমাদের জানা দরকার, কোথায় ছিলো শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। বিমান বন্দরের নথি বলছে, ২০০৬ সালে আজকের বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল আলমগীর ছিলেন বিমান প্রতিমন্ত্রী। তখন পর্যন্ত বিমান বন্দরে সিডিউলের বিপর্যয় ছিল খুবই নিয়মিত ঘটনা। ২০০৬ এর ২৯ জানুয়ারি থেকে ৪ ফেব্রুয়ারি মাত্র এক সপ্তাহের বিমানের ৪১টি ডিসি-১০ ফ্লাইটের একটিও সময়মতো ছাড়তে পারেনি। এর মধ্যে মাত্র একটি ফ্লাইট অল্প বিলম্বে ছেড়েছিল। বাকি ৪০ টি ফ্লাইট অনেক দেরিতে। কোনটা বাতিল হয়ে গিয়েছিল। ওই একই সময় এয়ারবাস-৩১০ প্লেনের ১১৬টি ফ্লাইটের মধ্যে মাত্র ১৭% ফ্লাইট নিয়মিত সময় চলাচল করেছে।

আবার এর পরের সপ্তাহে যদি দেখি, তাহলে দেখবো, ৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৬ থেকে ১১ ফেব্রুয়ারি ডিসি-১০ প্লেনের ৬৭টি ফ্লাইটের মধ্যে মাত্র একটি ফ্লাইট সময়মতো ছেড়েছিল। এয়ারবাস প্লেন দিয়ে পরিচালিত ৯৬টি ফ্লাইটের মধ্যে মাত্র ১৬টি চলেছিল নিয়মিত সময়ে। ওই সময় একটানা ২১ দিন বিমানের ডিসি-১০ এর কোন ফ্লাইটই সময়মতো চলাচল করেনি।

আজ দেশি-বিদেশি ৩৩টি এয়ারলাইনস ফ্লাইট পরিচালনা করছে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে। একটি রানওয়ে ব্যবহার করে প্রতিদিন গড়ে ১৫০টি ফ্লাইট ওঠা-নামা করছে। ফলে প্রায় পিক আওয়ারে একই সময়ে একাধিক ফ্লাইট থাকলে টেক অফের জন্য উড়োজাহাজগুলোকে সিরিয়াল ধরে অপেক্ষা করতে হয়। অন্যদিকে ল্যান্ডিংয়ের অনুমতি না পেলে আকাশে গো অ্যারাউন্ড করতে হয়। এতে এয়ারলাইনসগুলোর জ্বালানি খরচ যেমন বাড়ে, তেমনি ফ্লাইট শিডিউল ঠিক রাখাও হয় মুশকিলের। বর্তমানে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের বার্ষিক ৮০ লাখ যাত্রী পরিবহনের ক্ষমতা রয়েছে।

এই সময়ে বিমানবন্দরে যুক্ত হচ্ছে তৃতীয় টার্মিনাল। এতে থাকছে বর্তমানের চেয়ে ৩ গুণেরও বেশি যাত্রী এবং প্রায় দ্বিগুণ কার্গো ব্যবস্থাপনার সক্ষমতা। এরইমধ্যে নতুন ৫৫ টি এয়ারলাইন যাত্রী পরিবহন সেবা দিতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। বিমানবন্দর থেকে ফার্মগেট পর্যন্ত এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে চালু হয়েছে। ২ অক্টোবর সংবাদ সম্মেলনে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল মো. মফিদুর রহমান জানিয়েছেন,সরকারের মেগা প্রজেক্টগুলোর মধ্যে অন্যতম এই প্রজেক্ট সরাসরি আন্তর্জাতিক কমিউনিটির সাথে সম্পৃক্ত।

ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ আরও জানায় তৃতীয় টার্মিনাল চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশে বিদেশিদের যাতায়াত বাড়বে, পাশাপাশি বাংলাদেশিদের বিদেশে ভ্রমণ করা অনেক আরামদায়ক হবে। হিসাব অনুযায়ী ২০২৫ সালের মধ্যে বিমানবন্দরে যাত্রী পরিবহন সংখ্যা বাড়বে প্রায় দ্বিগুণ। বর্তমানে ৮০ লাখ যাত্রী সেবা নিশ্চিত করতে পারলেও, দেড় কোটি যাত্রী পরিবহনের জন্য বর্তমান বিমানবন্দর যথেষ্ট নয়।

এক সমিক্ষায় দেখা গেছে, ২০৩৫ সালের মধ্যে আড়াই কোটিতে উন্নীত হবে যাত্রী পরিবহন সংখ্যা। এই অতিরিক্ত যাত্রীর পরিমাণ সামলাতে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তৃতীয় টার্মিনাল নির্মাণের জন্য বাংলাদেশ সরকার এবং জাইকার যৌথ অর্থায়নে ২১,৩০০

কোটি টাকা ব্যয়ে ডিসেম্বর ২০১৯ সালে নির্মাণ কাজ শুরু হয়। এখন নতুন এই টার্মিনাল, ২ লাখ ৩০ হাজার বর্গমিটার বিস্তৃত, যা বছরে ১ কোটি ২০ লাখ যাত্রীদের পরিষেবা দেবে। যাত্রী হ্যান্ডলিং ক্ষমতা ৮০ লাখ থেকে ২ কোটিতে উন্নীত হবে। অতিরিক্তভাবে এই টার্মিনালে মোট ৩৭টি বিমানের জন্য অ্যাপ্রোন পার্কিং তৈরি হয়েছে, যা প্রায় ৫.৫ লাখ বর্গ মিটার এলাকা জুড়ে রয়েছে।

বর্মানে বিমান বন্দর ৭,০০০ বর্গমিটার আমদানি কার্গো কমপ্লেক্সটি বার্ষিক ৩ লাখ টন কার্গো আনলোড করে, এখন ৩৬,০০০ বর্গমিটার রপ্তানি কার্গো কমপ্লেক্স বার্ষিক প্রায় ৫.৫ লাখ টন কার্গো হ্যান্ডেল করবে। এছাড়াও, টার্মিনালে মেট্রোরেল এবং ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের সাথে সরাসরি সংযোগসহ একটি আলাদা স্টেশন থাকবে। থাকছে আন্তর্জাতিক মানের লাগেজ হ্যান্ডিলিং ও যাত্রীদের জন্য বিশ্বমানের সুযোগসুবিধা। নতুন টার্মিনাল পুরোপুরি চালু হলে কর্মসংস্থান হবে ৬ থেকে ৭শ নতুন কর্মকর্তা আর কর্মচারি।

২০১৯ সালের ডিসেম্বরে থার্ড টার্মিনাল প্রকল্পের নির্মাণ কাজ শুরু হয়। সিঙ্গাপুরের চাঙ্গি বিমানবন্দরের আদলে নির্মাণ হয়েছে এই তৃতীয় টার্মিনাল। ঢাকা কনসোর্টিয়ামের মাধ্যমে জাপানের মিত্সুবিশি ও ফুজিটা এবং কোরিয়ার স্যামসাং- এই তিন প্রতিষ্ঠান মিলে থার্ড টার্মিনাল নির্মাণ করেছে। বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এই প্রকল্পটি একনেকে অনুমোদন পায় ২০১৭ সালের ২৪ অক্টোবর। প্রকল্পের মোট নির্মাণ ব্যয় ধরা হয় ২১ হাজার ৩৯৮ কোটি টাকা। এর মধ্যে জাপানি সহযোগিতা সংস্থা জাইকা ঋণ হিসেবে দেয় ১৬ হাজার ১৪১ কোটি ২ লাখ ৪৫ হাজার টাকা। বাকি ৫ হাজার ২৫৮ কোটি ৩ লাখ ৮৮ হাজার টাকা দিয়েছে বাংলাদেশ সরকার।

প্রকল্পে কিছু খাতে টাকা সাশ্রয় হয়েছে। এই টাকা দিয়ে সরকার তৃতীয় টার্মিনালের ১২টি বোর্ডিং ব্রিজের জায়গায় অতিরিক্ত আরও ১৪টি বোর্ডিং ব্রিজ নির্মাণ করেছে। এখন বোডিং ব্রিজের মোট সংখ্যা ২৬ টি। এখানে রয়েছে মোট ৩৭টি অ্যাপ্রোন পার্কিং। এর ফলে একসঙ্গে ৩৭টি উড়োজাহাজ পার্ক করা যাবে। বিমানবন্দরে বর্তমানে ট্যাক্সিওয়ে আছে চারটি। নতুন করে আরও দুটি হাই স্পিড ট্যাক্সিওয়ে যোগ হয়েছে। রানওয়েতে উড়োজাহাজকে যাতে বেশি সময় থাকতে না হয়, সেজন্য তৈরি করা হয়েছে নতুন দুটি ট্যাক্সিওয়ে। এছাড়া পণ্য আমদানি ও রপ্তানির জন্য দুটি ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। থাকছে গাড়ি পার্কিংয়ের জন্য তিনতলা ভবন।

বেবিচকের তথ্যানুযায়ী, থার্ড টার্মিনালে ২৬টি বোর্ডিং ব্রিজের মধ্যে প্রথম ধাপে চালু করা হবে ১২টি। ফলে শুরুতেই ৫ লাখ ৪২ হাজার বর্গমিটার এলাকায় ৩৭টি উড়োজাহাজ পার্ক করা যাবে। বহির্গমনের জন্য ১৫টি সেলফ সার্ভিস চেকইন কাউন্টারসহ মোট ১১৫টি চেকইন কাউন্টার থাকবে। এছাড়া থাকবে ১০টি স্বয়ংক্রিয় পাসপোর্ট কন্ট্রোল কাউন্টার এবং ৬৬টি ডিপারচার ইমিগ্রেশন কাউন্টার। আগমনের ক্ষেত্রে পাঁচটি স্বয়ংক্রিয় চেকইন কাউন্টারসহ মোট ৫৯টি পাসপোর্ট ও ১৯টি চেকইন অ্যারাইভাল কাউন্টার থাকবে। থাকবে ১৬টি ব্যাগেজ বেল্ট।

বহুরকম সুযোগ সুবিধার থার্ড টার্মিনালে ঢোকা এবং বের হ্ওয়ার জন্যে কোন ঝক্কিঝামেলা থাকছে না। কারণ এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের একটি লুপ থার্ড টার্মিনালের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। থাকছে মেট্রোরেলের সংযোগও। হাজি ক্যাম্পের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের জন্য থাকছে টানেল। টানেলটি বিমানবন্দরের কাছে মেট্রোরেলের স্টেশনের সঙ্গেও যুক্ত হচ্ছে। ফলে বিদেশ থেকে যেসব যাত্রী আসবেন তারা খুব সহজেই বিমানবন্দর থেকে বেরিয়ে নির্দিষ্ট গন্তব্যে যেতে পারবেন। আবার যারা বিদেশ যাবেন, তারাও রাজধানীর যানজট এড়িয়ে খুব সহজে বিমানবন্দরে পৌঁছাতে পারবেন।

লেখক: গণমাধ্যমকর্মী।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিজ্ঞান ও গবেষণা দর্শন

বিজ্ঞান ও গবেষণার মাধ্যমে রাষ্ট্রের উন্নয়ন আজকের দিনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দিকনির্দেশনা রাষ্ট্রের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করছে। প্রধানমন্ত্রীর বিজ্ঞান ও গবেষণা সম্পৃক্ত চিন্তাগুলো এক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত হিসেবে আনা যেতে পারে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে চিন্তাগুলো বহুমাত্রিক। যেমন জলবায়ু বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর গবেষণা নির্ভর নিজস্ব একটা ধারণা গড়ে উঠেছে। ধারণাটি নিঃসন্দেহে

বহুমাত্রিক ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত।

তিনি জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে মৌলিক কিছু উপাদান চিহ্নিত করেছেন, এগুলো হচ্ছে খাদ্য, পানি ও অভিবাসন। জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটলে এই উপাদানগুলোও প্রভাবিত হয় ও এগুলোর পরিবর্তন মানুষের জীবনযাপন পদ্ধতিকে প্রভাবিত করে। যদি খাদ্যের বিষয়টি বিবেচনায় আনা হয় তবে দেখা যায়, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে খাদ্য উৎপাদন ও খাদ্যের মান—এই দুটি মৌলিক উপাদানের উপর নেতিবাচক প্রভাব পরে। এর ফলে মানুষের জীবন ও জীবিকার সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত নিরাপদ ও সুপেয় পানির অভাব দেখা দেয়, যা মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাপনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটায় মানুষ বাস্তচ্যুত হতে বাধ্য হচ্ছে। যার প্রভাব পড়ছে সমাজ ও অর্থনীতির ওপর, নিরাপত্তার ক্ষেত্রে এই উপাদানটি এক ধরণের মানবিক সংকটের জন্ম দিচ্ছে। এগুলোর প্রভাবে সম্পদের ওপর চাপ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ায় অর্থনীতির ভারসাম্য বিনষ্ট হচ্ছে। এ থেকে উত্তরণে জলবায়ু পরিবর্তন সহিষ্ণু শস্যব্যবস্থা, পানির যথাযথ ব্যবহার ও কার্যকর ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার পাশাপাশি পানি ব্যবস্থাপনায় একটি বৈশ্বিক তহবিল গঠনের ধারণা প্রধানমন্ত্রীর বিজ্ঞান ও গবেষণা দর্শনেরই প্রতিফলন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে তাঁর এই চিন্তাধারাকে কেবল তত্ত্বের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেননি, বরং উদ্ভাবনমুখী নীতিমালা ও জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে যে চ্যালেঞ্জগুলো রয়েছে সেগুলো মোকাবেলায় বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ ও জলবায়ু সংক্রান্ত গবেষণায় বিনিয়োগ বৃদ্ধি করেছেন। অভিযোজন নীতির অংশ হিসেবে জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন প্রকল্প থেকে শুরু করে বাস্তুতন্ত্র সংরক্ষণ আইন প্রণয়ন ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করায় বাংলাদেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি ও পরিবেশ বিপর্যয়ের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় অনেক বেশি প্রস্তুত। জলবায়ু অভিযোজন কর্মসূচি বাস্তবায়নের অগ্রদূত ও অভিযোজন নীতির স্বপক্ষের একজন বলিষ্ঠ প্রবক্তা হিসেবে শেখ হাসিনা অন্যদের জন্য অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত তৈরি করেছেন, যা তাঁর বিজ্ঞানমনস্ক মনোভাবেরই প্রতিফলন |

বিশ্বের সবচেয়ে উদ্ভাবনী চিন্তাসম্পন্ন সরকারপ্রধান হলেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ‘গ্লোবাল ইনোভেশন এক্সচেঞ্জ’ (জিআইই) বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে ‘মোস্ট ইনোভেটিভ পলিটিশিয়ান’ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানটি

সামগ্রিক উদ্ভাবনের বিষয়টিকে বিবেচনায় নিয়ে গবেষণামূলক কার্যক্রম করে থাকে ও সারা পৃথিবীর উদ্ভাবনমুখী ভাবনা ও সৃজনশীল আইডিয়াগুলো সংগ্রহ করে সেগুলো ম্যাগাজিনে প্রকাশ করে। গবেষণার তথ্য-উপাত্ত বিচার-বিশ্লেষণ করে তারা বলছেন, ‘বিশ্বের রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানদের মধ্যে উদ্ভাবনী ক্ষমতা ক্রমেই কমে যাচ্ছে। তাঁরা রুটিনমাফিক কাজ করেই রাষ্ট্র পরিচালনা করছেন। এ মুহূর্তে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ছাড়া এমন কোনো সরকারপ্রধান দেখা যাচ্ছে না, যাঁদের উদ্ভাবনী চিন্তা রাষ্ট্র পরিচালনায় প্রভাব রেখেছে।’

জিআইই তাদের বিশ্লেষণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার তিনটি উদ্যোগকে অত্যন্ত ক্রিয়েটিভ ও ইনোভেটিভ হিসেবে চিহ্নিত করেছে, যা অন্য দেশগুলো অনুসরণ করে তাদের দেশে সেগুলো বাস্তবায়নে অনুপ্রাণিত হয়েছে। সংস্থাটি ‘কমিউনিটি ক্লিনিক-এর ধারণাটিকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সবচেয়ে ইনোভেটিভ আইডিয়া হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দ্বিতীয় উদ্ভাবনী চিন্তার বাস্তবায়ন বলা হচ্ছে ‘একটি বাড়ি একটি খামার’, যার মাধ্যমে দারিদ্র্যপীড়িত মানুষের বাসস্থানের মতো মৌলিক চাহিদা যেমন পূরণ হয়েছে, তেমনই কর্মসংস্থানের মাধ্যমে নিজেদের আত্মনির্ভরশীল মানুষ হিসেবে প্রমাণ করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। মাত্র দুটো উপাদান মানুষের জীবনে পরিবর্তন ঘটিয়ে যে নতুন ধারণার জন্ম দিয়েছে, তা অর্থনীতি ও সামাজিক বিজ্ঞানের গবেষণায় নতুন নতুন চিন্তা যুক্ত করতে পারে। তাঁর তৃতীয় উদ্ভাবনী চিন্তার নাম ডিজিটাল বাংলাদেশ। হতদরিদ্র, অর্ধশিক্ষিত মানুষের হাতে তথ্য-প্রযুক্তি পৌঁছে দিয়ে কার্যত শেখ হাসিনা বাংলাদেশে এক নীরব বিপ্লব ঘটিয়েছেন। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে অর্থ আদান-প্রদানে বাংলাদেশ আজ বিশ্বের অন্যতম। তথ্য-প্রযুক্তির মাধ্যমে বদলে গেছে বাংলাদেশের চিত্র। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ডিজিটাল বাংলাদেশের ধারণাকে এগিয়ে নিতে স্মার্ট বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, ‘স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার মূল চাবিকাঠি হবে ডিজিটাল সংযোগ। স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার এবং স্মার্ট সমাজের জন্যে ডিজিটাল সংযোগ মূল ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে।’ ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে স্মার্ট বাংলাদেশে রূপান্তরে ডিজিটাল সংযোগের ধারণা প্রধানমন্ত্রীর উদ্ভাবনী চিন্তারই একটি অংশ, যেখানে স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট

অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার এবং স্মার্ট সমাজ অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক উপাদান ক্রিয়াশীল থাকবে। সবচেয়ে বড় কথা, স্মার্ট বাংলাদেশের মৌলিক ধারণা ও এর উপাদানগুলো নিয়ে প্রযুক্তিগত নির্ভর গবেষণা, অর্থনীতি সংক্রান্ত গবেষণা, সমাজ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সমন্বিত গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। আবার এই উপাদানগুলো একটি অন্যটির পরিপূরক হিসেবে কাজ করছে, যা ইন্টিগ্রেটেড রিসার্চের ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে।

অমর্ত্য সেন ও রিচার্ড এইচ থেলার মানবিক অর্থনীতির কথা বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী স্মার্ট অর্থনীতির কথা বলেছেন, যেখানে মানবিক বিষয়গুলোর উন্নয়নের সাথে সাথে মানবিক প্রগতির উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। এর সাথে, গবেষণা ও প্রযুক্তি নির্ভর অর্থনীতিকে যুক্ত করে মানুষ, সমাজ ও সরকারের যোগসূত্র গড়ে তোলা হয়েছে। স্মার্ট অর্থনীতি প্রধানমন্ত্রীর মৌলিক দর্শন থেকে উৎসারিত উদ্ভাবনী চিন্তারই প্রতিফলন, যা অর্থনীতি ছাড়াও এর সাথে সম্পৃক্ত বিষয়গুলোর সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্পর্কিত। মূলত প্রধানমন্ত্রী তাঁর গবেষণা লব্ধ উন্নয়নের ধারণাকে এমনভাবে গড়ে তুলেছেন, যেখানে গবেষণাও এগিয়ে যাবে, দেশের উন্নয়নও এগিয়ে যাবে। আর এগুলোর মূল উদ্দেশ্য হলো মানুষের কল্যাণ ও উন্নয়ন। কারণ প্রযুক্তির উন্নয়নের সাথে সাথে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে না পারলে পিছিয়ে পড়তে হবে।

বিজ্ঞান ও গবেষণা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিজের ভাবনার প্রতিফলন ঘটেছে। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, “গবেষণার মাধ্যমেই আমরা ব্যয় কমাতে এবং উৎপাদনের উৎকর্ষতা বাড়াতে পারি এবং বহুমুখী পণ্য উৎপাদনের মাধ্যমে রপ্তানি বাড়াতে পারি। আমি আশা করি নতুন নতুন পন্য সৃষ্টি এবং আমাদের রপ্তানি যেন অব্যাহত থাকে সেদিকে বিশেষভাবে আপনারা দৃষ্টি দেবেন।” দেশকে পরনির্ভরশীল না রেখে কিভাবে নিজেদের আহরিত সম্পদকে গবেষণার মাধ্যমে ব্যবহার করে দেশের উন্নয়নে কাজে লাগানো যায়, সেই বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর নিজের দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। গবেষণার মাধ্যমে দেশীয় উপাদানে তৈরি রপ্তানিমুখী শিল্প গড়ে তোলা ও আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে নিজেদের সক্ষমতা বাড়ানোর বিষয়গুলো সেই পরিকল্পনারই অবিচ্ছেদ্য অংশ | মনে রাখতে হবে, বিজ্ঞান ও গবেষণা কেবল বিজ্ঞানী ও গবেষকদের প্রচেষ্টায় সফল হতে পারেনা, যদি না সেখানে গবেষণাকে এগিয়ে নিয়ে গবেষণামনস্ক নেতৃত্ব গড়ে উঠে | আমরা সৌভাগ্যবান, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর কর্মপরিকল্পনাগুলো গ্রহণ ও বাস্তবায়নের

ক্ষেত্রে যেমন নিজের উদ্ভাবনী ধারণাকে প্রাধান্য দিচ্ছেন, তেমনই বিজ্ঞানী ও গবেষকদের উদ্ভাবন ও গবেষণায় নিজেদের এগিয়ে নিতে নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন।

প্রধানমন্ত্রী দেশের সকলকে নিজ নিজ জায়গা থেকে উদ্ভাবন চর্চা ও সেগুলোর বাস্তব প্রয়োগের মাধ্যমে নিজেদের বিজ্ঞানমনস্ক জাতি হিসেবে গড়ে তোলার সাহস যুগাচ্ছেন | সময় যত এগিয়ে যাচ্ছে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিরও তত পরিবর্তন ঘটছে | এই প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রীকে শেখ হাসিনা বলেছেন, “প্রযুক্তির প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হচ্ছে এবং নতুন থিওরি চতুর্থ শিল্প বিপ্লব এসে গেছে। এরফলে আমাদের লোকবল হয়তো কম লাগবে। কিন্তু প্রযুক্তিকে যথাযথভাবে ব্যবহার করতে হবে। তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে এবং সেজন্য আমাদের দক্ষ জনশক্তি দরকার। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আবার আমরা সম্পূর্ণ সেদিকে যেতে চাই না। আমরা শ্রমঘন শিল্পও করতে চাই। কারণ আমাদের বিশাল জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাও করতে হবে। এই দু’টি মিলিয়ে আমাদের দেশকে কীভাবে আমরা এগিয়ে নিতে পারি সেই চিন্তাই সবার মাথার মধ্যে থাকতে হবে।” এই কথাগুলোর মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর নিজের গবেষণালব্ধ ফলাফলের সমন্বয় ঘটেছে। প্রযুক্তি এগিয়ে গেলে অটোমেশনের কারণে মানুষের প্রয়োজন ফুরিয়ে আসবে | কিন্তু এখন আমরা জনসংখ্যাকে সমস্যা হিসেবে বলছিনা, বরং জন্যসংখ্যাকে জনসম্পদ বলছি। উন্নত বিশ্বে অটোমেশনের প্রয়োগ বেড়ে যাওয়ায় সেখানে বেকারত্ব ক্রমাগত বাড়ছে | বেকারত্বের কারণে হতাশা বাড়ছে, এর সাথে সামাজিক অপরাধ বাড়ছে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রযুক্তির বিকাশের সাথে সাথে শ্রমঘন শিল্পের কথা বলছেন, যেটি প্রযুক্তির বিকাশের সাথে সাথে মানুষের কর্মসংস্থান বাড়ানোর বিষয়টিকে নিশ্চিত করবে।

প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে আইটি পার্ক, হাইটেক সিটি, হাইটেক পার্ক, সফ্টওয়ার টেকনোলজি পার্ক, আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার, আইটি বিজনেস ইনকিউবেটর, ফ্রিল্যান্সিং ও আউটসোর্সিং এর মতো প্রযুক্তি নির্ভর ও কর্মসংস্থানমুখী বিভিন্ন সেক্টর গড়ে উঠেছে। এগুলোতেও গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী তাঁর গবেষণা দর্শন থেকে বুঝেছেন, শিল্পকারখানাগুলো এগিয়ে নিতে সেগুলোর প্রত্যেকটিতে রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট সেকশন থাকতে হবে। এর সাথে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সাথেও শিল্পকারখানাগুলোর গবেষণা সম্পৃক্ত যোগাযোগ থাকতে হবে। কারণ তিনি বিশ্বাস করেন, প্রযুক্তির অগ্রগতির সাথে সাথে শিল্পকারখানার উৎপাদিত পণ্যের

উৎকর্ষতা না ঘটলে শিল্পকারখানাগুলো পিছিয়ে পড়বে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলতে বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাকে গুরুত্ব সহকারে নিয়েছেন | শিক্ষকদের গবেষণায় প্রেরণা জোগাচ্ছেন, উন্নত ও আধুনিক ল্যাবরেটরি ফ্যাসিলিটি গড়ে দিচ্ছেন। ছাত্রদেরও গবেষণায় অনুপ্রাণিত করছেন। গবেষণাকে এগিয়ে নিতে বিশেষায়িত বিশ্ববিদ্যালয়ও গড়ে তোলা হচ্ছে। উন্মোচিত হচ্ছে বিজ্ঞান ও গবেষণার নতুন নতুন দ্বার ও সম্ভাবনা | গবেষণায় চ্যালেঞ্জ আছে, চ্যালেঞ্জ থাকবেই, তবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিজেদের সামর্থ্য ও শক্তিতে পদ্মা সেতু তৈরি করার বিজয়, আমাদের মনোবল জাগ্রত করেছে। এখন গর্ব করে বলা যায়, আমরাও পারি |

এখন দরকার সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টা। প্রধানমন্ত্রীর বিজ্ঞান ও গবেষণা দর্শনেও সেই সম্মিলিত প্রচেষ্টার প্রতিফলন ঘটেছে। সেটি এগিয়ে নেবার দায়িত্ব আমাদের সকলের। দেশ আমাকে কি দিলো সেটি বড় কথা নয়, দেশকে আমরা কি দিলাম সেটাই বড় কথা। বঙ্গবন্ধুর কথায়, মহাঅর্জনের জন্য দরকার মহত্যাগ | সেই মহত্যাগ হোক আমাদের অমিত শক্তি |

লেখক: কলামিস্ট ও লেখক, অধ্যাপক, ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।

শেখ হাসিনায় আস্থা ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে আবারও আলোচনার কেন্দ্রে ধর্মীয় সংখ্যালঘু ইস্যু। বলা হচ্ছে, সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা ও অধিকারের প্রশ্নে দেওয়া নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ রক্ষা করেনি। পাশাপাশি হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদও দাবি আদায়ে আন্দোলন কর্মসূচি পালন করছে। কিন্তু নির্বাচনের আগে কেন ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অধিকার নিয়ে হৈ চৈ? গেল ১৫ বছরে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অধিকার ও নিরাপত্তা কিছুই কী নিশ্চিত হয়নি? সনাতন ধর্মালম্বীরা কী সত্যিই ভালো নেই? ১৯৭৫ সাল

থেকে ২০০৮ সালের মতো দলে দলে দেশান্তরি হচ্ছে? সংসদে কী ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের পর্যাপ্ত প্রতিনিধি নেই?

দেশের শীর্ষস্থানীয় একটি গণমাধ্যমে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, দেশে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা ও অধিকারের প্রশ্নে দেওয়া নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ রক্ষা করেনি—এমন অভিযোগ তুলেছেন সংখ্যালঘু নেতারা। অসন্তোষ ও ক্ষোভ দেখা দিয়েছে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের মধ্যে। প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে তাঁরা রাজপথে আন্দোলনও চালিয়ে যাচ্ছেন। জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন গঠন এবং সংখ্যালঘু বিশেষ সুরক্ষা আইন প্রণয়নের প্রতিশ্রুতিও ছিল আওয়ামী লীগের ইশতেহারে। কিন্তু এখন পর্যন্ত সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হয়নি। এপ্রসঙ্গে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রানা দাশগুপ্তের বক্তব্যে বলা হয়েছে, অবজ্ঞা, অবহেলা ও সংখ্যালঘুদের নাগরিক হিসেবে গণ্য না করার মানসিকতা থেকে এসব দাবি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে না বলে অভিযোগ করেন হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রানা দাশগুপ্ত।

একাদশ জাতীয় নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ইশতেহারের মূল প্রতিপাদ্য ছিল ‘সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ’। সেখানে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জন্য কয়েকটি গুরত্বপূর্ণ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল আওয়ামী লীগ। এরমধ্যে অন্যতম প্রতিশ্রুতি ছিল- একটি জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন গঠন করে সংখ্যালঘু বিশেষ সুরক্ষা আইন প্রণয়ন করা। এছাড়া প্রতিশ্রুতি ছিল – অর্পিত সম্পত্তি সংশোধনী আইন দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকৃত স্বত্বাধিকারীদের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা; বৈষম্য বিলোপ আইন প্রণয়ন এবং সমতলের ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর জন্য পৃথক ভূমি কমিশন গঠন। এসব দাবি বহু দিন থেকে করে আসছিল বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা।

বর্তমান সরকারের শেষ সময়ে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জন্য করা নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন না হওয়ায় হতাশ হয়ে পড়ছেন অনেকে। এসব দাবি দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য আন্দোলনও করছে কয়েকটি সংগঠন। হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ আড়াই লাখ মানুষের স্বাক্ষরসংবলিত স্মারকলিপি প্রধানমন্ত্রীর কাছে দিয়েছে। এছাড়া প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের দাবিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে ১২ এপ্রিল, আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরের সঙ্গে ১৯ ফেব্রুয়ারি এবং আওয়ামী লীগের জাতীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির প্রধান সমন্বয়ক কবির বিন আনোয়ারের সঙ্গে ১৭ জুলাই বৈঠক করেন

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ ও তার নেতৃত্বে সংখ্যালঘু সংগঠনগুলোর ঐক্যমোর্চার নেতারা। পাশাপাশি সরকারকে চাপ দিতে আগামী ৪ নভেম্বর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে মহাসমাবেশের ডাক দিয়েছে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ।

আওয়ামী লীগ সরকার কী ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি কী কিছুই বাস্তবায়ন করেনি? আসুন পরিসংখ্যান দেখা যাক, বর্তমান সরকার ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জন্য কী করেছে। সনাতন ধর্মাবলম্বীদের জন্য দীর্ঘ ৬০ বছরের পুরানো সমস্যা মিটিয়ে ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরকে দেড় বিঘা জমি দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সম্পত্তির উত্তরাধিকারীদের সম্পত্তি মালিকানা দেওয়ার ক্ষেত্রে হেবা আইনের নিয়মমাফিক নামমাত্র অর্থের বিনিময়ে সম্পত্তি হস্তান্তর করার সমান সুযোগ দেওয়া হয়েছে। হিন্দু বিবাহ রেজিস্ট্রি আইন; শত্রু সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন করা হয়েছে। মন্দির সংস্কার, মন্দিরভিত্তিক শিক্ষাসহ বিভিন্ন কার্যক্রম করছে হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট। খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট এবং সালের বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট একই ভাবে কাজ করছে।

আগে সংসদে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্য ছিলেন মাত্র দুজন। এখন সংসদে সদস্য ২৩ জন। বিগত সরকারের সময়ে শুধু নামের কারণে অনেক যোগ্য ব্যক্তিকেও চাকরিতে নিয়োগ দেওয়া হয়নি, নিয়োগ হলেও পদোন্নতি হয়নি। জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে অংশীদারত্ব ও প্রতিনিধিত্ব গত ১৪ বছরে এ ক্ষেত্রে দৃশ্যমান অগ্রগতি হয়েছে। আগের চেয়ে প্রশাসনে সংখ্যালঘুদের অংশগ্রহণ বেড়েছে। আগে বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য কেউ ছিলেন না, এখন হচ্ছেন। বর্তমান সরকারের সময়ে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় থেকে প্রধান বিচারপতি হয়েছেন।

মূলত অর্পিত সম্পত্তি সংশোধনী আইন দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকৃত স্বত্বাধিকারীদের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা এবং জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন গঠন করার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল আওয়ামী লীগ, সেটিই শুধু বাস্তবায়ন হয়নি। এছাড়া ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ- গোষ্ঠী, ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য আওয়ামী লীগ তাদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বেশিরভাগ বাস্তবায়ন হয়েছে। যেমন- তিন পার্বত্যজেলার প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্য রাখা; ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জমি, জলাধার ও বন এলাকায় অধিকার সংরক্ষণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ; ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, দলিত ও চা-বাগান শ্রমিকদের সন্তানদের শিক্ষা ও চাকরির ক্ষেত্রে বিশেষ কোটা; ক্ষুদ্র জাতিসত্তা ও অন্য সম্প্রদায়ের ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও

জীবনধারার স্বাতন্ত্র্য সংরক্ষণ করা।

হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের এখন প্রধান দাবি জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন গঠন করা। যদিও এবিষয়ে মতামত জানতে সংগঠনটির নেতাদের গণভবনে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। তাদের কথা মন দিয়ে শুনেছেন এবং তা বাস্তবায়নের জন্য নির্দেশনাও দিয়েছেন। তখন বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছিল, অত্যন্ত হৃদ্যতা ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়। ঐক্য পরিষদের পক্ষে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক রানা দাশগুপ্ত বিগত ১৪ বছরে দেশের যে প্রভূত উন্নয়ন ঘটেছে তার প্রশংসা করার পাশাপাশি ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যাসমূহ প্রধানমন্ত্রীর কাছে তুলে ধরেন। কিন্তু বাংলাদেশে প্রতিটি ক্ষেত্রে আমলাতন্ত্রিক জটিলতা থাকে। আর তার দুর্নাম বইতে হয় সরকারি দলকে। এ প্রসঙ্গে আওয়ামী লীগের জাতীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির প্রধান সমন্বয়ক কবির বিন আনোয়ার বলেন, ‘আওয়ামী লীগের যে প্রতিশ্রুতি আছে, তার প্রতিটি বিষয় নিয়ে কাজ চলছে। যেমন আইনগুলো প্রণয়ন করা, কোনোটা সংসদে আছে, কোনোটা আইন মন্ত্রণালয়ে আছে, কোনোটা বিল আকারে পেশ হয়েছে, কোনোটা ধর্ম মন্ত্রণালয়ে পেন্ডিং (ঝুলে) আছে।

জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন গঠন না হওয়ার কারণে আওয়ামী লীগ ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জন্য কিছুই করেনি তা বলা ঠিক হবে না। কারণ জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন কীভাবে গঠন করা হবে, এর পরিধি বা কাজ কী হবে নানান বিষয় জড়িয়ে আছে। সবাই দাবি জানিয়েছে কিন্তু কেউ এর রূপরেখা দেয়নি যে কেমন হতে পারে জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন। তাই সরকারকে নানা উপায় ও পথ দেখতে হচ্ছে।

ভারতে ১৯৯২ সালে ন্যাশনাল কমিশন ফর মাইনরিটিস (এনসিএম) গঠন করা হয়। এই কমিশন সংখ্যালঘুদের উন্নয়নের অগ্রগতি মূল্যায়ন করে। সংবিধানে প্রদত্ত সুরক্ষা নিশ্চিত করে। কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকার কর্তৃক সংখ্যালঘুদের স্বার্থ রক্ষার জন্য কার্যকর সুপারিশ করে। সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে যে কোনো বৈষম্যের কারণে তৈরি হওয়া সমস্যা নিয়ে গবেষণা করে এই কমিশন। এছাড়া সংখ্যালঘুদের আর্থ-সামাজিক ও শিক্ষাগত উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে অধ্যয়ন, গবেষণা ও বিশ্লেষণ পরিচালনা করে। এছাড়া ভারতে রয়েছে সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রণালয়। যার অধীনে রয়েছে, সংখ্যালঘু জাতীয় কমিশন, জাতীয় সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও অর্থ অধিদপ্তর, হজ কমিটি, মৌলানা আজাদ

শিক্ষা ফাউন্ডেশন, ন্যাশনাল ওয়াকফ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লি., দর্গা খাজা সাহেব আজমীর, কেন্দ্রীয় ওয়াকফ কাউন্সিল, ভাষাগত সংখ্যালঘুদের কমিশনার।

পাকিস্তানেও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সংরক্ষণের জন্য আলাদা কমিশন আছে। ২০১৪ সালে পেশোয়ার গির্জায় বোমা হামলার মামলার পর পাকিস্তানের সুপ্রিম কোর্ট সংখ্যালঘুদের জন্য একটি জাতীয় কাউন্সিল গঠন করতে সরকারকে নির্দেশ দিয়েছিল। পরে ২০২০ সালে গঠন করা হয় পাকিস্তান ন্যাশনাল কমিশন ফর মাইনরিটিজ। তিন বছর মেয়াদের এই কমিশনে চেয়ারম্যানসহ ছয়জন সরকারি এবং ১২ জন বে-সরকারি সদস্য রয়েছে। বেসরকারি ১২ জনের মধ্যে রয়েছে ২ জন মুসলমান, ৩ জন হিন্দু, ৩ জন খ্রিস্টান, ২ জন শিখ, ১ জন পার্সি এবং ১ জন কালশা সম্প্রদায়ের। যদিও এই কমিশনের খুব বেশি ক্ষমতা নেই। কারণ এটি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন। এছাড়া সংখ্যালঘু কমিশনে দু’জন সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান সদস্য করায় সমালোচনাও হয়েছে।

আমাদের দেশে কীভাবে গঠন করা হবে সংখ্যালঘু কমিশন, তার ক্ষমতাই বা কী হবে, পাকিস্তানের মতো নখ-দন্তহীন সংখ্যালঘু কমিশন নাকি ভারতের মতো হবে এনিয়ে আলোচনার প্রয়োজন আছে। সংখ্যালঘু কমিশনের ক্ষমতা-কর্মপরিধি ইত্যাদি বিষয়ে একটি রূপরেখা তুলে ধরা দরকার। এই কাজটি করতে পারে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদসহ যে কোনো সংগঠন। পাশাপাশি তৈরি করতে হবে জনমত। এজন্য এগিয়ে আসতে হবে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের স্বার্থ নিয়ে কাজ করা সব সংগঠনকে। পাশাপাশি সংসদে যারা ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্ব করেন তাদেরও অনেক দায়িত্ব আছে। এছাড়া যারা দেশের মানুষের মধ্যে সাম্য চান, যারা বাংলাদেশের সম্প্রীতি চান তাদেরও সোচ্চার হওয়া প্রয়োজন। শুধু সরকারের গুণগান করলেই হিতৈষী হওয়া যায় না। সরকারের অঙ্গিকারগুলো স্মরণ করিয়ে দেয়া এবং সেগুলো বাস্তবায়ন না হলে জনগণের মধ্যে কী প্রতিক্রিয়া হতে পারে, সে বিষয়ে সরকারকে সতর্ক করে দেওয়া হিতৈষীদের অন্যতম কর্তব্য।

সংখ্যালঘুদের জন্য কেউ যদি আন্তরিকতার সাথে কিছু করে থাকে যেটি আওয়ামী লীগ করেছে। এজন্য এখনো দলটির সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপর আস্থা রাখছেন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষেরা। কারণ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, বাংলাদেশের মাটিতে নিজের যতটা অধিকার, ঠিক ততটাই অধিকার দেশের প্রতিটি ধর্মের মানুষের। তাই নিজেদের সংখ্যালঘু না ভেবে দেশের নাগরিক হিসেবে সমান অধিকার নিয়ে চলার আহ্বান জানিয়েছেন বঙ্গবন্ধু-কন্যা।

লেখক: গণমাধ্যমকর্মী।

এই প্রস্তাব দিতেই পারেন না আবিগেইল বয়েড

“বাংলাদেশকে ম্যাগনিটস্কি স্টাইল স্যাংশন দেয়া উচিত অস্ট্রেলিয়া সরকারের” গত ২১ সেপ্টেম্বর অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলস পার্লামেন্টে ‘অস্ট্রেলিয়ান গ্রিনস’ দলের এমপি আবিগেইল বয়েড এমপির এমন প্রস্তাব জানার পরপরই কয়েক দফা প্রশ্ন তুলেছেন নামী কূটনিতিকরা।

প্রথমত তারা বলছেন, ম্যাগনিটস্কি স্টাইল স্যাংশন দেয়ার শুরু হয়েছিল একটি বিশেষ মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনার মধ্য দিয়ে। মূলত, ২০০৯ সালে রাশিয়ার কারাগারে নির্যাতনের শিকার হয়ে সের্গেই ম্যাগনিটস্কির নামে এক রুশ ট্যাক্স আইনজীবী হয়। মৃত্যুর পর ২০১২ সালে ম্যাগনিটস্কি আইন পাস করে যুক্তরাষ্ট্র। পরে তারা এই স্যাংশন দেয় ম্যাগনিটস্কির খুঁজে বের করা ৩৯ জন দুর্নীতিগ্রস্ত রাশিয়ানের ওপর। যারা ম্যাগনিটস্কির মৃত্যুর সঙ্গে জড়িত ছিল।

প্রাদেশিক সংসদে বাংলাদেশের উপর ম্যাগনিটস্কি স্টাইলে স্যাংশন আরোপের দাবি তোলার আগে, পূর্বে অস্ট্রেলিয়ান সরকার মাত্র একবার ২০২২ সালে এই স্যাংশনের প্রয়োগ করে। তাই প্রশ্ন উঠেছে, ম্যাগনিটস্কি স্টাইলে আবিগেইল বয়েড যে স্যাংশন আরোপ করতে বলেছেন সেটা কী আইনত অস্ট্রেলিয়ার সরকার দিতে পারে? কারণ অস্ট্রেলিয়াতেই তো বৈধ নয় ম্যাগনিটস্কি স্টাইল স্যাংশন।

একটু পেছনে ফিরে তারা বলেন, ২০১৮ সালে অস্ট্রেলিয়ার লেবার পার্টির এমপি মাইকেল ড্যানবি সংসদে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ও দুর্নীতি (ম্যাগনিটস্কি নিষেধাজ্ঞা) বিল ২০১৮ উত্থাপন করেছিলেন। কিন্তু নির্বাচনের আগে ২০১৯ সালে সংসদ ভেঙে দিয়ে বিলটি বাতিল হয়ে যায়। পরে ২০২১ সালে ৮ ডিসেম্বর, অস্ট্রেলিয়ান সংসদ গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘন, আন্তর্জাতিক মানবিক আইন লঙ্ঘন, গুরুতর দুর্নীতি এবং সুশাসন ও আইনের শাসনকে ক্ষুণ্ণকারী কার্যকলাপের

জন্য ম্যাগনিটস্কি স্টাইলের স্যাংশনের আইন আংশিকভাবে পাস করে।

যে আইন অস্ট্রেলিয়াতে সম্পূর্ণভাবে পাশই হলো না, সে আইনে কীভাবে আবিগেইল বয়েড স্যাংশন দাবি করলেন? কূটনীতিকরা বলেন, এটা যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সুর মেলানো ছাড়া কিছুই নয়।

পরে আরও বলা হয়, প্রস্তাব উত্থাপনকারী আবিগেইল অস্ট্রেলিয়ার সংসদে কতোটুকু প্রভাব বিস্তার করেতে পারেন? তিনি তো অস্ট্রেলিয়ার প্রাদেশিক সংসদের সদস্য, মূল সংসদের নন। খোদ অস্ট্রেলিয়ান কর্মকর্তারা এব্যাপারে কথা বলার সময় বিষয়গুলো হেসে উড়িয়ে দিয়ে বলেন, অস্ট্রেলিয়া সরকার এই মুহূর্তে এটা মানার কোনো যুক্তিই দেখছে না। কারণ এই আইনের আওতায় মানবাধিকার লঙ্ঘন বা বড়ো ধরনের দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত ব্যক্তি বা সরকারি কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা দেয় মার্কিন প্রশাসন।

এ নিষেধাজ্ঞায় পড়লে ওই ব্যক্তির সম্পদ জব্দ করা হবে এবং তিনি যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করতে পারবেন না। যুত্তরাষ্ট্রের পর কানাডা, যুক্তরাজ্য ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের মতো বেশ কয়েকটি দেশ একই ধরনের আইন পাস করে।

তারা আরও বলেন, অস্ট্রেলিয়ায় যদি বাংলাদেশের ওপর ম্যাগনিটস্কি আইন প্রয়োগ করতে পারেও তাহলেও কী বাংলাদেশে সেই বাস্তবতা আছে? বাংলাদেশে এমন কোনো পরিস্থিতি তো সৃষ্টি হয়নি যেখানে অস্ট্রেলিয়া ম্যাগনিটস্কি স্টাইলে স্যাংশন দেয়া যেতে পারে। এই দাবি উত্থাপনের পেছনে মানবাধিকার লঙ্ঘনজনিত উদ্বেগের চেয়ে ব্যাক্তি স্বার্থরক্ষাই মুখ্য মনে হচ্ছে।

ব্যক্তি বা সরকারি কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে কারণ ম্যাগনিটস্কি স্টাইল স্যাংশন দেয় যুক্তরাষ্ট্র ও এর মিত্ররা। এরই মধ্যে রাশিয়া, চীন ও ইরানের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে এই নিষেধাজ্ঞা দিচ্ছে ওয়াশিংটন। কিন্তু অস্ট্রেলিয়া এখন্ও সেই পথে হাঁটবে না। কারণ অস্ট্রেলিয়ার সাবেক সরকারগুলির তুলনায় এক বৈচিত্র্যময় পার্লামেন্টের সূচনা করেছে। দীর্ঘ ৯ বছর পর, ২০২২ সালের ২৩ মে অস্ট্রেলিয়ায় সরকার গঠন করে ক্ষমতাসীন লেবার পার্টি।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে কেন এমন একটা অবান্তর দাবি তুললেন প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য আবিগেইল বয়েড? বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচনের আগে দেশে বিদেশের নানা অপপ্রচারের উদাহরণ টেনে কূটনীতিকরা বলছেন, এটাও বাংলাদেশ সরকারবিরোধী লবিস্টদেরদের সেই পুরোনো স্টাইল।

আমেরিকা ব্রিটেন বা অস্ট্রেলিয়ার মত দেশে কোন দলের ফান্ডে টাকা দিলেই তাদের দিয়ে অনেক কিছু বলিয়ে নেয়া যায়। এটা তাদের দেশে খুবই বৈধ বিষয়। আবিগেইল বয়েড একজন ব্রিটিশ বংশোদ্ভুদ আইনজীবী। বিদেশি লবিং প্রতিষ্ঠানগুলো মূলত এরাই চালায়। সুতরাং তার পক্ষে গ্রিন দলে কিছু ফান্ড নেয়ার বিনিময়ে এরকম একটি প্রস্তাব তুললে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।

লেখক: গণমাধ্যমকর্মী।

মানুষের কল্যাণে পারমাণবিক শক্তির ব্যবহার করছে বাংলাদেশ

যেকোনো রাষ্ট্রের শক্তি জানান দেয় পারমাণবিক সক্ষমতার উপর। পারমাণবিক অস্ত্র পৃথিবীর অনেক দেশেই মজুত আছে। সেটি বরং সংঘাতের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। সবচেয়ে বেশি পারমাণবিক অস্ত্র মজুতের শীর্ষে আছে রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র। এ ছাড়াও, চীন, ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য, পাকিস্তান, ভারত, ইসরায়েল ও উত্তর কোরিয়াসহ ৯ দেশের কাছে পারমাণবিক অস্ত্র আছে। দক্ষিণ এশিয়ায় পারমাণবিক ক্ষমতাধর রাষ্ট্র হচ্ছে ভারত ও পাকিস্তান। দুটো দেশের রাজনৈতিক টানাপড়েনের কারণে পারমাণবিক শক্তির মাধ্যমে আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা চলে আসছে বহুদিন ধরে। বাংলাদেশ এদিক থেকে ব্যতিক্রম ভুমিকা পালন করছে। কারো সঙ্গে বৈরিতার পথে না গিয়ে নিজ দেশের মানুষকে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের উদ্যোগ নিয়েছে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মাধ্যমে।

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের মাধ্যমে বিশ্বের ৩৩তম পারমাণবিক শক্তি ব্যবহারকারী দেশ হতে যাচ্ছে বাংলাদেশ। এই বিদ্যুৎকেন্দ্রে ব্যবহারের জন্য জ্বালানি হিসেবে ইউরেনিয়াম গত বৃহস্পতিবার বাংলাদেশে এসে পৌঁছেছে। এরইমধ্যে তা কড়া নিরাপত্তার মধ্য নিয়ে রূপপুরে পৌঁছাছে। আগামী ৫ অক্টোবর রূপপুরে ইউরেনিয়াম আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তরে এক অনুষ্ঠান হওয়ার কথা রয়েছে। এটি উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট

ভ্লাদিমির পুতিন। তাঁরা দুজন অনুষ্ঠানে অনলাইনে যুক্ত হতে পারেন।

ওয়ার্ল্ড নিউক্লিয়ার অ্যাসোসিয়েশনের ওয়েবসাইটে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, পারমাণবিক শক্তি ব্যবহারকারী দেশের মধ্যে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, চীন, ফ্রান্স, রাশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, কানাডা, ইউক্রেন, জার্মানি, জাপান, স্পেন, সুইডেন, বেলজিয়াম, যুক্তরাজ্য, ভারত, চেক প্রজাতন্ত্র, ফিনল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড, বুলগেরিয়া, পাকিস্তান, হাঙ্গেরি, স্লোভাকিয়া, ব্রাজিল, দক্ষিণ আফ্রিকা, মেক্সিকো, রোমানিয়া, আর্জেন্টিনা, সংযুক্ত আরব আমিরাত, বেলারুশ, স্লোভেনিয়া, নেদারল্যান্ডস, ইরান ও আর্মেনিয়া।

পাবনার ঈশ্বরদীতে নদীর তীর ঘেঁষে গড়ে উঠেছে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র। নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যেই প্রকল্পটি দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে। বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু হওয়ার আগেই আশপাশের এলাকার মানুষের ভাগ্যের চাকা ঘুরে গেছে।

পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে কাজ করেন প্রায় পাঁচ হাজার বিদেশি কর্মী। তাদের বেশিরভাগই রুশ নাগরিক। তাদের দৈনন্দিন চাহিদা মেটাতে রূপপুরে এসেছে পরিবর্তন। আগে যেখানে সন্ধ্যা হলেই গাঢ় অন্ধকার নেমে আসতো এখন সেখানে গভীর রাতেও ঝলমল করে নানা রঙের আলো।

পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ শুরুর পর গত কয়েক বছরে সেখানে গড়ে উঠেছে নানা অবকাঠামো। পাশাপাশি রুশভাষাভাষী কয়েক হাজার বিদেশি কর্মীদের অবস্থানে সেখানকার অর্থনীতি ও জীবনযাত্রায় প্রভাব পড়েছে রাশিয়ার ভাষা ও সংস্কৃতির। সেখানে প্রায় প্রতিটি দোকানেই রাশিয়ার ভাষা সম্বলিত সাইনবোর্ড দেখা যায়। স্থানীয়রা বিদেশি নাগরিকের দৈনন্দিন পণ্য বিক্রি করে হচ্ছেন স্বাবলম্বী।

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রটিতে রাশিয়ার সেরা কর্মকৌশল চর্চা, বহু বছরের অভিজ্ঞতা এবং বৈজ্ঞানিক চিন্তাকে কাজে লাগানো হয়েছে। প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, বিদ্যুৎ ইউনিটের অ্যাকটিভ ও প্যাসিভ ব্যবস্থার অনন্য সংমিশ্রণ কেন্দ্রের নিরাপদ পরিচালনা নিশ্চিত করবে এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পিত মাত্রার নিশ্চয়তা দেবে। আশা করা যায়, পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেবল বাংলাদেশে জ্বালানি সরবরাহের সমস্যার সমাধানই করবে না, দেশবাসীর সার্বিক জীবনমানের উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

নির্মাণ কাজ শেষ হলে রূপপুর কেন্দ্রের দুটি ইউনিটে ২ হাজার ৪০০

মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের কথা রয়েছে। বর্তমানে পৃথিবীর ৩০টি দেশে ৪৫০টির মতো পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র রয়েছে। সেগুলো থেকে উৎপন্ন বিদ্যুতের পরিমাণ মোট উৎপন্ন বিদ্যুতের প্রায় ১২ শতাংশ। এসব বিষয় বিবেচনা করে বর্তমান সরকার জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নে কার্যকর পদক্ষেপের অংশ হিসেবে দেশে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ১০ শতাংশ পারমাণবিক বিদ্যুৎ থেকে উৎপাদনের মহাপরিকল্পনা নিয়েছে। এটা নিশ্চিতভাবে বর্তমান সরকারের উত্তম প্রয়াসগুলোর অন্যতম একটি এবং জাতি হিসেবে বিশ্বে গর্ব করার মতো একটি প্রকল্প।

যেকোনো দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিদ্যুতের ব্যবহার অপরিহার্য। উন্নয়ন অব্যহত রাখতে হলে প্রয়োজন পর্যাপ্ত বিদ্যুতের সরবরাহ। ২০০১-২০০৬ সাল পর্যন্ত বিএনপি-জামাত জোট সরকারের সময়ে ব্যাপক দুর্নীতি ও লুটপাটের ফলাফল হিসেবে এদেশের বিদ্যুৎখাত পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যায়। ২০০৮ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসে দেশকে সে অবস্থা থেকে তুলে এনে আজকে শতভাগ বিদ্যুতায়নের দেশ বাংলাদেশ। কিন্তু ধারাবাহিক উন্নয়ন, শিল্পায়ন ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নিশ্চয়তায় আরও বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রয়োজন। তার জন্য পারমাণবিক শক্তি ব্যবহারের বিকল্প আর কিছু হতে পারে না। জলবায়ু পরিবর্তনের কথা চিন্তা করে বর্তমানে বিশ্বে টেকসই শক্তি উৎপাদনে যেসব উৎসের ওপর জোর দেয়া হচ্ছে পারমাণবিক শক্তি তার অন্যতম একটি উৎস।

আশা করা হচ্ছে, অর্থনীতিতে একটি শক্ত ভীত গড়বে এই পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প। একে ঘিরে তৈরি হবে আরও নতুন নতুন কর্মসংস্থান, সম্ভাবনা। পারমাণবিক শক্তি ব্যবহারকারী দেশ হওয়ার সাথে সাথে জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক পারমাণবিক পর্যবেক্ষণ বোর্ডের সদস্য হল বাংলাদেশ, যা দেশের ইতিহাসে নতুন একটি মাইলফলক। জাতিসংঘের পারমাণবিক পর্যবেক্ষণ বোর্ড পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ উপায়ে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত ব্যবহার নিশ্চিত করতে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় আন্তঃসরকারি ফোরাম হিসেবে কাজ করে। সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশে নানা সুবিধা প্রাপ্ত হবে।

লেখক: গণমাধ্যমকর্মী।